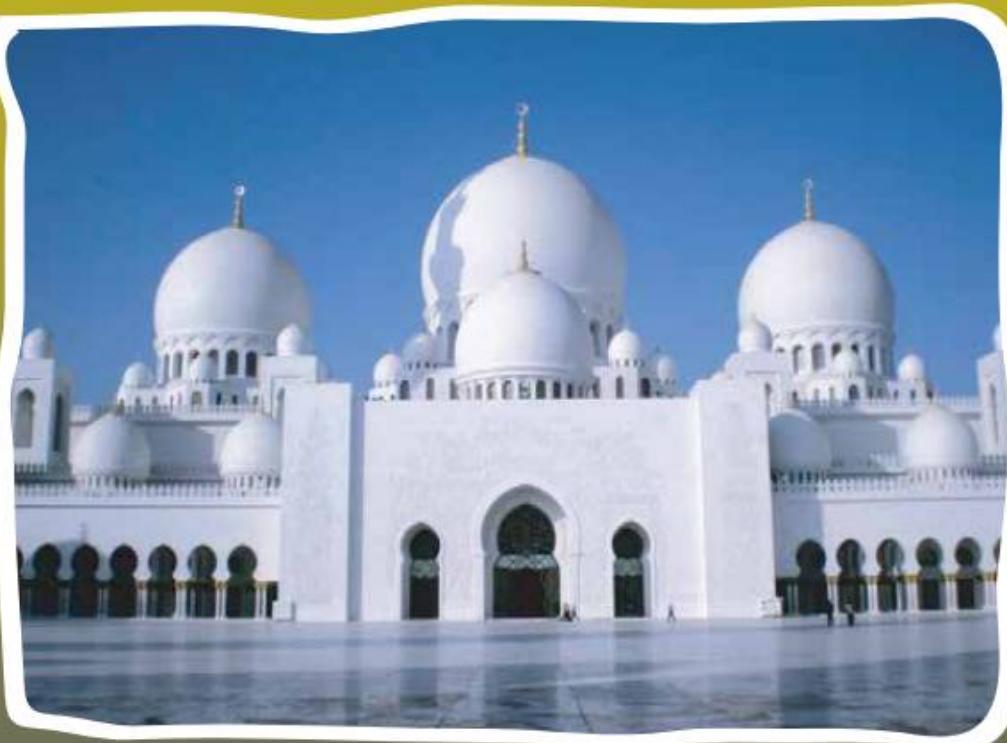


ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংক্রান্ত রচনা ও সম্পাদনা

ডেস্ট্রে মো. আখতারুজ্জোমান

মুহাম্মদ তমীয়ুদ্দীন

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ড. মোহাম্মদ ইউস্ফুফ

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ

ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংক্রান্ত	:	সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংক্রান্ত	:	অক্টোবর ২০২৪
পরিমার্জিত সংক্রান্ত	:	অক্টোবর ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসম্বৃদ্ধি ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়গুলিনে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সূজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষাকে জীবনধনিষ্ঠ করতে এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজ ধর্মের মৌলিক রীতিসমূহের পরিচিতি প্রদান জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পদ চেতনায় উত্তুক হয় সেসব দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োজন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুবন্ধ না হয়ে বরং আনন্দশীল হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখিতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ফেস্টে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল করীর চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : আকাইদ	পৃষ্ঠা	চতুর্থ অধ্যায় : আখলাক	পৃষ্ঠা
তাওহিদ	১	আখলাকে হামিদাহ	৭৯
কালিমা তায়িবা	৩	সত্যবাদিতা	৮০
কালিমা শহাদত	৫	পিতামাতার প্রতি কর্তব্য	৮১
ইমানে মুজমাল	৬	আজীয়সজনের প্রতি কর্তব্য	৮৩
আল-আসমাউল হুসনা	৭	প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য	৮৪
বিসালাত	৯	বড়োদের প্রতি শুঙ্কা ও ছোটোদের প্রতি স্নেহ	৮৬
আখিরাত	১০	সহপাঠীদের সাথে সহ্যবহার	৮৭
আকাইদ ও নেতৃত্ব	১৩	আখলাকে যামিমাহু	৮৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদত		মিখ্যাচার	৮৯
ইবাদতের ধারণা ও তাৎপর্য	১৯	গিবত বা পরনিষ্ঠা	৯০
নাজাসাত	২০	গালি দেওয়া	৯১
পবিত্রতা	২২	ধূমপান ও মাদকাসক্তি	৯২
ওজু	২৩	পঞ্চম অধ্যায় : আদর্শ জীবনচরিত	
তায়াম্মুম	২৫	মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ	৯৮
গোসল	২৬	হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনাদর্শ	১০১
সালাত	২৭	হ্যরত উমর ফারক (রা.)-এর জীবনাদর্শ	১০২
সালাতের সময়সূচি	২৮	হ্যরত খানিজা (রা.)-এর জীবনাদর্শ	১০৫
সালাত আদায়ের নিয়ম	২৯	হ্যরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর জীবনাদর্শ	১০৭
সালাতের ফরজ	৩১	হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর জীবনাদর্শ	১০৮
সিজদাহু	৩৫		
সিজদায়ে তিলাওয়াত	৩৬		
সালাতের নেতৃত্ব শিক্ষা	৩৭		
তৃতীয় অধ্যায় : কুরআন ও হাদিস শিক্ষা			
আল-কুরআনের পরিচয়	৪৪		
কুরআন তিলাওয়াত	৪৬		
তাজবিদ	৪৭		
মাখরাজ	৪৮		
অর্থ ও পটভূষিসহ আল-কুরআনের কতিগম্য সূরা	৫৬		
সূরা আল-ফাতিহা	৫৬		
সূরা আন-নাস	৫৮		
সূরা আল-ফালক	৬১		
সূরা আল-হুমায়াহ	৬৩		
সূরা আল-আসর	৬৫		
অর্থসহ মুনাজাত বিষয়ক তিনটি আয়ত	৬৮		
আল-হাদিস	৬৯		
অর্থসহ নেতৃত্ব গুণবলি বিষয়ক দুটি হাদিস	৭১		
অর্থসহ মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস	৭২		
নেতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হাদিস	৭৩		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقَائِدُ)

‘আকাইদ’ আরবি শব্দ। এটি বহুবচন। এর অর্থ হলো বিশ্বাসমালা। এর একবচন হলো ‘আকিদাহ’ (الْعَقِيْدَةُ), যার অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসকে ‘আকাইদ’ বলা হয়। যেমন : আল্লাহ, নবি-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তাকদির, পুনরুত্থান ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- আকাইদের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- তাওহিদের (একত্ববাদ) ধারণা, তৎপর্য ও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অর্থসহ কালিমা তায়িবা ও কালিমা শাহাদাত শুন্দ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইমান মুজমাল (ইমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়) অর্থসহ শুন্দ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আল্লাহর কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রিসালাতের ধারণা ও প্রযোজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আখিরাতের ধারণা, বিশ্বাসের গুরুত্ব ও পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিকতা উন্নয়নে ‘আকাইদ’-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

তাওহিদ (الْتَّوْهِيدُ)

তাওহিদের ধারণা

তাওহিদ (الْتَّوْهِيدُ) আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় একে বলা হয় একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় সন্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে তাওহিদ বা একত্ববাদ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা। তিনি ব্যক্তিত ইবাদতের ঘোগ্য কেউ নেই। তিনিই হলেন একমাত্র ইলাহ। তিনি সকল দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালার প্রতি একপ বিশ্বাসই হলো তাওহিদ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ إِلَهٌ مُّنِيبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ ۝

অর্থ: বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন (সকলেই তার মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪)

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সন্তাগতভাবে যেমনি একক, তেমনি গুণাবলিতেও তুলনাহীন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ একক সন্তা। তার কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি কারো সন্তান নন। আবার কেউ তার সন্তানও নয়। গুণাবলির দিক থেকেও মহান আল্লাহ অদ্বিতীয়। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি চিরস্থায়ী, ফর্মা নং-১, ইসলাম শিক্ষা-৬ষ্ঠ

চিরঞ্জীব, শাশ্বত ও সত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, পুরস্কারদাতা, শান্তিদাতা ইত্যাদি। তিনি 'লা-শারিক'। তার সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই। তার গুণাবলির সাথে কোনো কিছুরই তুলনা করা যায় না। তার তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই।

তাওহিদের তাৎপর্য

আমরা আমাদের চারপাশে নানারকম জিনিস দেখতে পাই। সুন্দর সুন্দর ফুল, ফল, গাছপালা, তরমতা, পশ্চপাখি ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে নদীনালা, পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, সাগর, মহাসাগর। আরও আছে বিশাল আকাশ, চন্দ, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি। আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এমন অনেক বস্তু এবং প্রাণীও রয়েছে। এ সব কিছুই সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত। এগুলো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজ থেকে সৃষ্টি হয়নি। নিচয়ই একজন স্তুষ্টা এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তার কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। তিনি **নুর** (কুন) অর্থাৎ 'হও' বলার সাথে সাথেই সবকিছু সৃষ্টি হয়ে যায়।

বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এগুলো থেকে উপকার লাভ করে। সুতরাং মানুষের উচিত তার স্তুষ্টার প্রতি কৃতভ্রতা প্রকাশ করা। এক আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ইবাদত করা। তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। এভাবে মহান আল্লাহর তাওহিদ বা একত্বাদের প্রতি অনুগত হলে মানুষ দুনিয়া ও আধিরাত্রের জীবনে কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে।

তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহিদ বা আল্লাহ তায়ালার একত্বাদে বিশ্বাস আকাইদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। সকল নবি-রাসূল (আ.) তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সকলেই ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এক ও অবিভািয়। তার তুল্য কিছুই নেই। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করে। আর তাওহিদে বিশ্বাসীগণ আধিরাতে জান্মাত লাভ করবেন।

তাওহিদে বিশ্বাসের উদাহরণ

আমরা সকলেই হ্যরত ইবরাহিম (আ.)-এর নাম শুনেছি। তিনি ছিলেন একজন নবি ও রাসূল এবং মুসলিম জাতির পিতা। তিনি এক মূর্তিপূজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। তাঁর সময়ের লোকজন আল্লাহ তায়ালার একত্বাদে বা তাওহিদে বিশ্বাস করত না। বরং তারা মূর্তিপূজা করত। তাদের রাজা নমরুদের উপাসনা করত। হ্যরত ইবরাহিম (আ.) এসব করতেন না। তিনি ভাবলেন মূর্তি বা নমরুদ কোনো কিছুর স্তুষ্টা হতে পারে না। কেননা এগুলো নিজেরাই ধৰ্মসশীল। সুতরাং এদের উপাসনা করা ঠিক নয়।

এভাবে তিনি স্তুষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি ভাবলেন যে আকাশের তারকা, চন্দ, সূর্য ইত্যাদি হয়তো মানুষের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি বুঝতে পারলেন যে এগুলো মানুষের স্তুষ্টা বা ইলাহ নয়। কেননা এগুলো কোনোটাই স্থায়ী নয়। এরা অস্ত যায়, অদৃশ্য হয়। বরং এ সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন তিনিই ইলাহ, তিনিই মারুদ। অতঃপর তিনি সেই অদৃশ্য সত্ত্বার প্রতি ইমান আনলেন ও তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন

করলেন। এভাবে বিশ্বজগতের নানা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে হ্যরত ইবরাহিম (আ.) মহান আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

অতএব, তাওহিদ অর্থ একত্বাদ। আল্লাহ তায়ালা তার সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়। আমরা তাওহিদে বিশ্বাস করব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। আল্লাহ তায়ালার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না।

তাওহিদের শিক্ষা

আকাইদের সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদ অর্থ আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা, তার সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। তাওহিদ থেকে আমরা নিষ্পত্তিশীল শিক্ষা লাভ করতে পারি :

১. আমরা আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করবো এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবো না।
২. আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করবো, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করবো না।
৩. আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সবকিছু তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য আমরা সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো।
৪. আল্লাহ তায়ালা বিপদ-আপদ থেকে একমাত্র মুক্তিদাতা। সুতরাং বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা সবসময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবো।
৫. আমরা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ জানবো ও সেইসব নামে তাকে ডাকব এবং আল্লাহর গুণে গুণাদ্঵িত হওয়ার চেষ্টা করবো।
৬. আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবসময় দেখছেন এবং আমাদের সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং আমরা সর্বদা ভালো কাজ করবো এবং অন্যায়, অত্যাচার ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ থেকে দূরে থাকব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল তাওহিদের পরিচয় ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলবে। অন্যদল একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বলবে।

পাঠ ২

কালিমা তায়িবা (كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাঝে নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।

তাৎপর্য

কালিমা তায়িবা অর্থ হলো পবিত্র বাক্য। এটি তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এ কালিমা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। এ কালিমার দুটি অংশ।

প্রথম অংশ : لَا إِلَهَ إِلَّا لَلَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)



অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মারুদ নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে ইলাহ বা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হতে পারে না। চন্দ্ৰ, সূর্য, তাৱকারাজি, পাহাড়, পৰ্বত, বাঘ-সিংহ, রাজা-বাদশাহ কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। বৰং এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই হলেন একমাত্র মারুদ। তাকে ছাড়া আৱ কাৱো ইবাদত বা উপাসনা কৱা যাবে না। এমনকি তাৱ ইবাদতে অন্য কাউকে শৱিক কৱাও যাবে না। আৱবি ‘লা-ইলাহা’ শব্দেৰ অর্থ কোনো ইলাহ নেই; আৱ ‘ইল্লাল্লাহ’ অর্থ আল্লাহ ছাড়া। কালিমার এ অংশটি না-বোধক শব্দ দ্বাৱা শুল্ক কৱা হয়েছে। এটি খুবই গুৱাত্তপূৰ্ণ। আমৱা কোনো পাত্ৰে ভালো কিছু নেওয়াৰ আগে প্ৰথমে ঐ পাত্ৰটি খালি কৱে ফেলি। যেন ঐ জিনিসটি অন্য কিছুৰ সাথে মিশ্ৰিত না হয়। একটি উদাহৰণ দিলে বিষয়টি বোৰা যাবে। যেমন: একটি গ্লাসে পানি রয়েছে। তুম যদি ঐ গ্লাসে দুধ নিতে চাও তাহলে কী কৱে? প্ৰথমে গ্লাসেৰ পানিটুকু ফেলে দেবে। তাই না? এৱপৰ খালি গ্লাসে দুধ নেবে। গ্লাসে পানি রেখে দিয়ে তাতে দুধ নিলে দুধ আৱ পানি মিশ্ৰিত হয়ে যাবে। ফলে দুধেৰ গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। অন্ধপ তাওহিদে বিশ্বাসেৰ জন্য প্ৰয়োজন পৰিব্র অন্তৱ। অর্থাৎ প্ৰথমে অন্তৱ থেকে সবৱকমেৰ ভুল ও আন্ত বিশ্বাস দূৰ কৱতে হবে। ‘লা-ইলাহা’ দ্বাৱা এটাই কৱা হয়। অতঃপৰ ‘ইল্লাল্লাহ’ দ্বাৱা আল্লাহ তায়ালার প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৱা হবে।

আমাদেৱ প্ৰিয় নবি হযৱত মুহাম্মদ (স.) যখন মক্কা নগৱীতে ইসলাম প্ৰচাৱ শুল্ক কৱেন, তখন আৱবেৰ লোকেৱা ছিল মূৰ্তিপূজক। তাৱা নানাকৰণ মূৰ্তি, গাছপালা, চন্দ্ৰ, সূৰ্য, পাহাড়, পৰ্বত ইত্যাদিৰ পূজা কৱত। এজন্য রাসুলুল্লাহ(স.) এ কালিমাৰ দাওয়াত দেন। ফলে আৱবেৰ লোকজন মূৰ্তিপূজা থেকে অন্তৱকে পৰিষ্কাৱ কৱে আল্লাহ পাকেৱ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৱে।

দ্বিতীয় অংশ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (মুহাম্মদুৰ রাসুলুল্লাহ)

অর্থ : মুহাম্মদ (স.) আল্লাহৰ রাসুল। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্ৰেৰিত নবি ও রাসুল। এ কথাৱ উপৰ বিশ্বাস স্থাপন ইমানেৰ অংশ। কালিমা তায়িবাৰ প্ৰথম অংশেৰ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৱা যেমন জৱাবি, দ্বিতীয় অংশেৰ প্ৰতি ইমান আনাও তেমনই আবশ্যক। আল্লাহৰ একত্ৰিবাদে বিশ্বাসেৰ পাশাপাশি মহানবি হযৱত মুহাম্মদ (স.)-এৰ প্ৰতিও বিশ্বাস স্থাপন কৱতে হবে। কেননা তাৱ মাধ্যমেই আমৱা আল্লাহ পাকেৱ পৰিচয় লাভ কৱি। তিনিই আমাদেৱ নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌছে দিয়েছেন। ভালোমন্দ, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি তিনিই আমাদেৱ শিক্ষা দিয়েছেন। আৱ এসব তিনি নিজ থেকে শিক্ষা দেননি। বৰং মহান আল্লাহৰ নিৰ্দেশেই শিক্ষা দিয়েছেন। সুতৰাং আমৱা বিশ্বাস কৱব যে, হযৱত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তিনি নবি ও রাসুল। তিনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীৰ্ণ। যাতে রয়েছে মানুষেৰ জীৱন পৰিচালনাৰ যথাৰ্থ বিধিবিধান।

কালিমা তায়িবা ইমানেৰ মূলভিত্তি। অতএব, আমৱা শুন্দভাবে এ কালিমা পড়ো। এৱ অর্থ বুৱো আন্তৱিকভাবে বিশ্বাস কৱব এবং এৱ মৰ্মানুসাৰে জীৱনেৰ সকল কাজ পৰিচালনা কৱব।

কাজ : শিক্ষাৰ্থীৱা প্ৰত্যেকে বাড়ি থেকে বড় একটি কাগজে ‘কালিমা তায়িবা’ অৰ্থসহ লিখে একটি পোস্টাৱ তৈৱি কৱে নিয়ে আসবে এবং শ্ৰেণিতে উপস্থাপন কৱবে।

পাঠ ৩ কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ شَهَادَةٍ)

أَشْهُدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ : আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাহ্লা ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই । তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) তার (আল্লাহর) বান্দা ও রাসুল ।

তাৎপর্য

কালিমা শাহাদাত হলো— সাক্ষ্যদানের বাক্য । অর্থাৎ এ কালিমা দ্বারা ইমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয় । আমরা এ কালিমা উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করি । আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন । তিনি আমাদের রব । তিনি আমাদের রিজিক দেন, প্রতিপালন করেন, সুস্থিতা দান করেন । তিনি আমাদের নানারূপ নিয়ামত দান করেন । আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য, সবকিছুই তার দান । সুতরাং আমাদের উচিত তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । অপরদিকে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুল । তিনিই আমাদের নিকট আল্লাহ পাকের পরিচয় তুলে ধরেছেন । সত্য, মিথ্যার পার্থক্য শিখিয়েছেন । জাগ্রাতে যাওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন । সুতরাং সকল কাজে তার আনুগত্য করা এবং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাও অত্যাবশ্যিক ।

কালিমা শাহাদাতের মাধ্যমে আমরা এ দুটো কাজই করতে পারি । তাছাড়াও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পারি ।

কালিমা তায়িবার ন্যায় কালিমা শাহাদাতও দুটি অংশে বিভক্ত । যথা—

প্রথম অংশ : أَشْهُدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাহ্লা ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু)

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই । তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই ।

এ কথার দ্বারা তাওহিদ বা একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া হয় । অর্থাৎ আমরা এর দ্বারা সাক্ষ্য দেই যে, মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় । তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে একক । তার কোনো শরিক বা সমতুল্য নেই । ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা কাউকে তাঁর শরিক করি না ।

দ্বিতীয় অংশ : وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)

অর্থ : আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) তার বান্দা ও রাসুল ।

কালিমার এ অংশ দ্বারা মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া হয় । অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি যে, হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুল । তিনি নিজে আল্লাহ নন কিংবা আল্লাহর ^২/_১ অংশও নন । বরং তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা । তিনিও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতেন ।

তবে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আল্লাহ তায়ালার মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল। তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন।

কালিমা শাহাদাত ইমানের অন্যতম প্রধান বাক্য। এর দ্বারা মানুষ নিজ ইমানের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা শুন্দরভাবে এ কালিমা পড়ব এবং এর মর্মার্থ অনুসারে আমল করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একে অপরকে কালিমা শাহাদাত অর্থসহ মুখস্থ শোনাবে।

পাঠ ৪

(إِيمَانٌ مُجْمِلٌ) ইমানে মুজমাল

- أَمْنَتْ بِإِلَهٍ كَمَا هُوَ أَسْمَاهُ وَصِفَاتِهِ وَقَبِيلُتْ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ -

উচ্চারণ : আমানতু বিল্লাহি কামা হ্যাবি বি আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামিঁআ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি।

অর্থ : আমি ‘ইমান’ আনলাম আল্লাহর উপর, ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তার সকল নাম ও গুণসহ। আর আমি তাঁর সকল হৃকুম ও বিধিবিধান গ্রহণ করে নিলাম।

তাৎপর্য

‘ইমান’ শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর ‘মুজমাল’ অর্থ সংক্ষিপ্ত। অতএব, ইমান মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। সংক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস ছাপন করা ও আনুগত্য স্বীকার করাকে ইমান মুজমাল বলা হয়। এ বাক্য দ্বারা আমরা পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্ব ও বিধান স্বীকার করে থাকি।

আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অতুলনীয়। কোনো কিছুই তার তুল্য নয়। আবার তার ন্যায়ও অন্য কিছু নেই। তার সত্তা ঠিক তারই মত। কোনো মানুষ তার সত্তা, আকার আকৃতির কল্পনা করতে পারে না। তিনি যেমন আছেন সেরূপই তাকে বিশ্বাস করতে হবে। তার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তিনি সকল গুণের অধিকারী। সবরূপ গুণ তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। এসব নাম ও গুণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।

মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি নানা আইন-কানুন প্রদান করেছেন। নবি-রাসুলগণ এগুলো মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া এসব বিধিবিধান মানুষকে সফলতা ও মুক্তি দান করে। এগুলো অনুসরণ করলে, মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা সর্বদা তার আদেশগুলো মেনে চলব। যেসব কাজ থেকে মহান আল্লাহ আমাদের নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বর্জন করব।

আমরা ইমান মুজমাল শুন্দরপে পড়ব। এর অর্থ বুবো আন্তরিকভাবে তা স্বীকার করব। আর জীবনের সর্বাবস্থায় এবং সকল কাজে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একে অপরকে ইমানে মুজমাল অর্থসহ মুখস্থ শোনাবে এবং তা নিজেদের খাতায় লিখে একে অপরকে দেখাবে।

পাঠ ৫

আল-আসমাউল হসনা (আল-সেমাই আহসনী)

আল-আসমাউল হসনা আরবি শব্দ। আল-আসমা শব্দের অর্থ নামসমূহ। আর হসনা অর্থ সুন্দরতম। অতএব, আল-আসমাউল হসনা অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ। আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নামকে একত্রে আল-আসমাউল হসনা বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন—

وَلِلَّهِ الْأَكْمَلُ أَحْسَنُ هَا

অর্থ: “আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা তাকে সেই সব নামেই ডাকবে।” (সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত: ১৮০)

আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের আধাৰ। যেমন: তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, ফ্রাশীল, দয়াবান, ধৈর্যশীল, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, অতিপালক ইত্যাদি। এমন কোনো গুণ নেই যা তার মধ্যে নেই। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এগুলো হলো গুণবাচক নাম। গুণবাচক এসব নামই আল-আসমাউল হসনা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। আমরা আল্লাহ পাকের ৯৯টি (নিরানবইটি) গুণবাচক নামের কথা জানি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের কোনো শেষ নেই। এগুলো অসংখ্য। তবে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো এ নিরানবইটি নাম।

এসব নাম আল্লাহ তায়ালার পরিচয় প্রকাশ করে। যেমন: আল্লাহ খালিক। খালিক অর্থ সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা। সুতোঁৎ আমরা এ নাম দ্বারা বুবাতে পারি যে, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। এভাবে গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালোভাবে চিনতে পারি। ফলে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ আমরা অনুশীলন করব। এতে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। সকলেই আমাদের ভালোবাসবে। আল্লাহ তায়ালাও আমাদের ভালোবাসবেন।

আল্লাহু মালিক (الله مالک)

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর মালিক। মালিক অর্থ অধিকারী। তিনি আসমান জমিন, চন্দ, সূর্য, ঘৃহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, গাছপালা, নদী, সাগর সবকিছুর অধিগতি। সকল কিছুই তার নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোনো কিছুই তার আদেশ লজ্জন করে না। পশ্চপাথি, কীটপতঙ্গের মালিকও তিনিই। পৃথিবীতে বড়ো-ছোটো সকল বস্তুই তার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা মানুষেরও মালিক। আমাদের জীবন-বৃত্ত্য তারই নিয়ন্ত্রণে। আমাদের ধনসম্পদ, সৌনারপা সবকিছুর প্রকৃত মালিকও তিনিই। পৃথিবীতে আমরা তার অতিনিধি। এ হিসেবে আমরা ধনসম্পদের আমানতদার মাত্র। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত ও পরকালের মালিক। জাহান-জাহান তারই অধিকারে। শেষ বিচারের দিনের মালিকও তিনিই। এক কথায় বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবকিছুই মালিক হলেন মহান আল্লাহ।

আল্লাহু কারিম (الله كرييم)

কারিম আরবি শব্দ। এর অর্থ দয়াময়, মহানুভব, উদার ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা অতীব মহান, করুণাময়। উদারতা, দয়া, মায়া, মেহ, সহনশীলতা, ঔদার্য, ফ্রাশ ইত্যাদি গুণাবলি পরিপূর্ণভাবে তার সত্ত্ব বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ অসীম

তাই তার মায়া, ক্ষমা, সহনশীলতা ইত্যাদি সীমাহীন। আমাদের কেউ কাউকে দয়া দেখালে, ক্ষমা করলে, আমরা এই ব্যক্তিকে কতইনা মহান ভাবি। আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে তার গুণগান করি। কিন্তু মহান আল্লাহ যে কত বড় দয়াময়, উদার, ক্ষমাশীল তা আমরা অনুমানও করতে পারি না। কেননা তিনি তো মহামহিম অসীম সন্তান অধিকারী। তিনি সকল সৃষ্টির প্রতিই উদার ও মহানুভব। আলো, বাতাস, পানি, চন্দ, সূর্য, জীবজন্তু, পাহাড়, নদী, আসমান জমিন সবই আল্লাহর নিয়ামত। বিনিময় প্রত্যাশা ছাড়া উদারভাবে অকাতরে তিনি সকলের প্রতি নিয়ামত বিতরণ করেন। তার মহানুভবতার কোনো সীমা নেই। তার এ অসীম এবং অফুরন্ত দয়া, মায়া ও উদারতার জন্য সকলকে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, শোকের আদায় করা উচিত।

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের অনুসরণে আমরাও অন্যের প্রতি উদার ও দয়াপূর্ণ আচরণ করব। কথায়, কাজে বাস্তব জীবনে মহানুভব হবো।

আল্লাহু আলিম (الله علیم)

আলিম আরবি শব্দ। এর অর্থ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ যিনি সবকিছু জানেন বা যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা হলেন আলিম। তিনি সকল জ্ঞানের আধার, তার জ্ঞান অসীম। তার জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি আসমান জমিনের সবকিছুর খবরই জানেন। আমাদের সকল কথাবার্তা, কাজকর্ম তিনি জানেন। এমনকি আমরা অন্তরে যা চিন্তা করি তিনি সেগুলোও জানেন। আমরা যা কঙ্কনা করি বা স্বপ্ন দেখি সেগুলোও তার জ্ঞানের বাইরে নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন—

وَاللهُ علِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

অর্থ: অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৪)।

আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সীমাহীন। তার জ্ঞানকে কেউই ফাঁকি দিতে পারে না। ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমস্ত খবরও তার জ্ঞান। সমুদ্রের তলদেশে কিংবা মহাশূন্যে কোথায় কী হচ্ছে সবই তিনি জানেন। মোটকথা সবই তার জ্ঞানের আওতাধীন। সুতরাং আমরা সবসময় এ কথা মনে রাখব। আল্লাহ তায়ালা অসম্প্রস্তুত হন এমন কোনো কাজ করব না।

আল্লাহু হাকিম (الله حكيم)

হাকিম আরবি শব্দ। এর অর্থ প্রজ্ঞাময়, হিকমতের অধিকারী, সুবিজ্ঞ, সুনিপুণ কর্মদক্ষ। মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবে হাকিম অর্থ আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, সুদক্ষ, সুনিপুণ ও হিকমতের মালিক। এই মহাবিশ্ব তিনি যেমন সর্বোত্তম দক্ষতার সাথে সৃজন করেছেন, তেমন মহা প্রজ্ঞা, সুনিপুণ ও সুদক্ষ কৌশলের সাথে আবহমানকাল থেকে পরিচালনা করছেন। আকাশের তারকারাজি, চন্দ, সূর্য, মেঘমালা, নদনদী, আলো, বাতাস, আগুন, পানি, ফুল, ফল, বৃক্ষ-লতা, আসমান-জমিন, জীবনমরণ, স্বাদ-গন্ধ ও রূপ-রস যে দিকেই আমরা তাকাই সর্বত্রই এক সুন্দর সুনিপুণ কৌশল দেখতে পাই। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন, “যিনি সৃষ্টি করেছেন ত্তরে ত্তরে সন্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?” (সূরা আল-মুল্ক, আয়াত : ৩)

মহান আল্লাহর মহা প্রজ্ঞার নির্দেশন দেখে আমরা তার প্রতি সুদৃঢ় ইমান আনব, শ্রদ্ধায় বিন্দুভাবে তাকে স্মরণ করব। সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে যে প্রজ্ঞা ও হিকমত বিদ্যমান তা উপলব্ধি করে নিজেরা চিন্তাশীল হবো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় উৎসাহী হবো। খাঁটি ইমানদার হওয়ার পাশাপাশি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানমনস্ক হবো। আমাদের লেখাপড়া ও দৈনন্দিন কাজকর্ম গুছিয়ে সুশৃঙ্খল-সুনিপুণভাবে সময়ানুবর্তী হয়ে সমাপন করতে চেষ্টা করব। তাতে আমাদের জীবন সার্থক ও সফল হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহর চারটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকটির একটি
করে শিক্ষা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬ রিসালাত (رِسَالَةٌ)

রিসালাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ বার্তা, খবর, চিঠি বা সংবাদ বহন। রাসূলগণ যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় রিসালাত। আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলগণকে নানা দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন : মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করা, সত্য দীন প্রচার করা, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, মহান আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়া ইত্যাদি। রাসূলগণের এ সকল দায়িত্বকে এক কথায় রিসালাত বলা হয়।

ইসলামি আকিদায় তাওহিদের পরই রিসালাতের স্থান। এক্ষেত্রে নবুয়াত ও রিসালাত প্রায় সার্থক।

নবি-রাসূলগণের পরিচয়

নবি-রাসূলগণ হলেন মহান আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা মনোনীত বান্দা। নবুয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদের নির্বাচিত করেছেন। যিনি নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করেন তিনি হলেন নবি। আর রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে বলা হয় রাসূল।

নবি-রাসূলগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। তাঁরা কেউ আল্লাহর অংশ বা আল্লাহ তায়ালার পুত্র ছিলেন না। বরং মানুষের মধ্য থেকেই আল্লাহ পাক তাঁদের নির্বাচন করেছেন। তাঁরা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁরা সর্বদা নেক ও ভালো কাজ করতেন। অন্যায় ও অশ্রীল কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তাঁরা উভয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

নবি-রাসূলগণ মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁরা মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে দায়াত দিতেন। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী ও বিধান পৌছে দিতেন। আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে মানুষকে হাতেকলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা সবসময় মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَرَسُلًا قَدْ قَصَّنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرَسُلًا لَمْ نَقْصَنْهُمْ عَلَيْكَ

অর্থ: অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে অপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আপনাকে বলিনি (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪)।

কুরআন মাজিদ বা কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিসে তাঁদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস রাখব, আল্লাহ তায়ালা যত নবি রাসূল পাঠিয়েছেন আমরা সবার ওপর ইমান রাখি। সর্বথেম নবি ছিলেন হ্যরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর পর দুনিয়াতে আর কোনো নবি আসেননি, আসবেনও না।

নবি-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ নানা কারণে মানুষের মধ্যে নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

- নবি-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহ পাকের পরিচয় জানিয়েছেন।
- তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ও সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করতেন।
- ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির পার্থক্য নবি-রাসূলগণই শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা মানুষকে উন্নত ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা মানুষের নিকট আসমানি কিতাবসমূহের বাণী পৌছে দিতেন।
- হাতেকলমে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার বিধান শিক্ষা দিতেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাওহিদের পরই রিসালাতের স্থান। রিসালাতে অর্থাৎ নবি-রাসূলগণকে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা নবি-রাসূলগণই আমাদের আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানিয়েছেন। তার বাণী পৌছে দিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস না করলে আল্লাহ তায়ালা ও তার বাণীকে অস্বীকার করা হয়। অতএব, ইমানের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

নবি-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত মানব। মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহর প্রেরিত সব নবি-রাসূলের প্রতি আমরা ইমান আনব। তাঁদের আনীত বাণীকে সম্মান করব। আর সর্বশেষ নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) - এর দেখানো পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নবি-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা খাতায় লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭ আখিরাত (ؑؑ)

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের দুনিয়ার জীবনকে বলা হয় ইহকাল। আর ইহকালের পরের জীবনই হলো পরকাল। আরবিতে একে বলা হয় আখিরাত। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলা হয় আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতে মানুষ জান্নাতের শান্তি বা জাহানামের শান্তি ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পরপরই আমাদেরকে আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে চরিত্রবান ও সৎকর্মশীল করে তোলে। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে জানে আখিরাতে মানুষকে দুনিয়ার কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে। সেখানে দুনিয়ার কাজকর্নের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে সে পুরস্কার লাভ করবে। তার স্থান হবে চিরশাস্তির জাহান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পাপ ও অন্যায় কাজ করবে সে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে। সে জাহানামের আগমে দণ্ড হবে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস করলে মানুষ ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়, মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করে।

বলা হয়ে থাকে, ‘দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।’ শস্যক্ষেত্রে মানুষ যেরূপ চাষাবাদ করে সেরূপ ফসল লাভ করে। যেমন কেউ ধান চাষ করলে ধান লাভ করে। গম চাষ করলে গম লাভ করে। তেমনি ভালো করে চাষাবাদ করলে ফসল বেশি লাভ করে। আর অলসতার কারণে চাষাবাদ না করে জমি ফেলে রাখলে সে কিছুই লাভ করে না। দুনিয়া ও আখিরাতের অবস্থাও ঠিক তেমন। আমরা যদি দুনিয়াতে ভালো কাজ করি, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলি তাহলে আখিরাতে ভালো ফল লাভ করব। আর যদি নিজ ইচ্ছামতো চলাফেরা করি, অন্যায় ও পাপ কাজ করি তাহলে আমরা পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবো। সুতরাং পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য দুনিয়াতেই আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আখিরাতের পর্যায়সমূহ

আখিরাত বা পরকালের বেশ কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন : কবর, কিয়ামত ও হাশর।

কবর

পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ বা পর্যায় হলো কবর। একে ‘আলমে বারযাথ’ও বলা হয়। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে এ জীবনের শুরু হয়। এরপর কিয়ামত বা হাশর পর্যন্ত কবরের জীবন চলতে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُرُونَ

অর্থ: আর তাদের সামনে বারযাথ থাকবে পুনরুদ্ধান দিবস পর্যন্ত (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১০০)।

মৃত্যুর পর মানুষকে কাফন পরিয়ে কবরে রাখা হয়। এ সময় কবরে দুইজন ফেরেশতা আগমন করেন। তাঁদের নাম মুনকার-নাকির। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে তিনটি থশ্ম করেন। এগুলো হলো— তোমার রব কে? তোমার দীন কী? এবং তোমার নবি কে? যেসব লোকের কবর দেওয়া হয় না তারাও এ থশ্ম থেকে রেহাই পায় না।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে এবং রাসূলের নির্দেশ মেনে চলে তারা এ প্রশংসনের সঠিক উন্নতির দিতে পারবে। তাদের কবর হবে শাস্তিময়। আর যারা দুনিয়াতে ইমান আনেনি, দীন মেনে চলেনি তারা এসব থশ্মের উন্নতির দিতে পারবে না। তারা সে সময় শুধু আফসোস করবে। কবরের জীবন তাদের জন্য হবে অতি কষ্টদায়ক।

কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়। পৃথিবীতে এমন একসময় আসবে যখন মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যাবে। দুনিয়াতে আল্লাহ বলার মতো কোনো লোক থাকবে না। সে সময় আল্লাহ পাক দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হ্যরত ইসরাফিল (আ.) শিঙায় ফুঁক দেবেন। ফলে মহাপ্রলয় ঘটবে। এ দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পাহাড়, পর্বত তুলার ন্যায় আকাশে উড়তে থাকবে। পৃথিবীর নিচের সমুদ্র ধনসম্পদ বের হয়ে আসবে। সবকিছু উলট-পালট হয়ে যাবে। কোনো প্রাণী বা বস্তু অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। তিনি ব্যতীত আর কেউ বিরাজমান থাকবে না। এ অবস্থাকেই বলা হয় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

হাশর

হাশর শব্দের অর্থ সমাবেশ, ভিড়, চাপ ইত্যাদি। কিয়ামতের পর বহুকাল একমাত্র আল্লাহ পাক বিদ্যমান থাকবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সমস্ত প্রাণীকে জীবিত করবেন। তাঁর হৃকুমে হ্যরত ইসরাফিল (আ.) দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁক দেবেন। ফলে সকল প্রাণী পুনরায় জীবিত হবে। একে বলা হয় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এ সময় একজন ফেরেশতা স্বাইকে আহবান করবেন। ফলে সকলে একটি বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। একে বলা হয় হাশর। আল্লাহ তায়ালা এখানে সকলের পাপপুণ্যের হিসাব নেবেন। সকল মানুষকে সে সময় আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন সূর্য মাথার অতি নিকটে থাকবে। প্রচঙ্গ গরমে মানুষ ঘামতে থাকবে। এমনকি অনেকে ঘামের মধ্যে সাঁতার কাটবে। আল্লাহ রাবুল আলামিনের আরশের ছায়া ব্যতীত সেদিন অন্য কোনো ছায়া তথা আশ্রয়স্থল থাকবে না। ইমানদার পুণ্যবানগণ সেদিন আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবেন। তাঁদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আমলনামায় দুনিয়ার জীবনের সকল পাপপুণ্যের হিসাব লেখা থাকবে। পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। এরপর আল্লাহ পাক মহাবিচার শুরু করবেন। এটিই হলো শেষ বিচারের দিন। এদিন মহান আল্লাহ হবেন একমাত্র বিচারক। নবি-রাসূল ও ফেরেশতাগণ এদিন সাক্ষী হবেন। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও এদিন সাক্ষ্য দান করবে। আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এদিন তাঁর উম্মতদের জন্য সুপারিশ (শাফাতাত) করবেন। হাশরের ময়দানে মানুষের পাপপুণ্যের ওজন করা হবে। এটি সম্পন্ন হবে মিয়ান-এর মাধ্যমে। মিয়ান হলো পরিমাপক যন্ত্র। যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁরা জান্নাতের নানারকম নিয়ামত ভোগ করবেন। সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে। যাদের মিয়ানে পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা হবে জাহানামী। জাহানাম হলো ভীষণ কষ্টের স্থান। সেখানে তারা আগুনে দাঢ় হবে। তবে কখনো মারা যাবে না। বরং কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনই হলো আধিরাত। সেখানে মানুষের পাপপুণ্যের হিসাব নেওয়া হবে। পুণ্যবানগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর পাপীরা জাহানামের শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং আমরা দুনিয়াতে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিয়েখ মেনে চলব। ন্যায় ও সৎকাজ করব। তবেই পরকালে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আখিরাতের স্তরসমূহের একটি ধারাবাহিক তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮

আকাইদ ও নৈতিকতা

ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আকাইদ। যেমন: তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি। আর নৈতিকতা হলো নীতির অনুশীলন। অর্থাৎ কথা ও কাজে উভয় রীতিনীতির অনুশীলন করা, মার্জিত ও বিনয়ী হওয়া, উভয় চরিত্রবান হওয়া ইত্যাদি। অন্যায়, অশীল ও অশালীল বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করাও নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিকতা ও নীতির অনুসরণ মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। পশুর কোনোরূপ নীতিবোধ নেই। সে যা ইচ্ছ তা-ই করতে পারে। ভালোমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কোনো কিছুরই সে পরোয়া করে না। সে শুধু নিজের লাভ ও কল্যাণই বোঝে। নীতিহীন মানুষও ঠিক তেমনি। সে কোনোরূপ আইনকানুন, বিধিবিধান মানে না। সে নৈতিক আচরণ পালন করে না। বরং নিজের লাভের জন্য সে অপরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। মিথ্যা, অত্যাচার, ধোকা দেওয়া, পরচর্চা ইত্যাদি তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। সমাজে সে নানারূপ অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। কোনো মানুষই তাকে ভালোবাসে না।

অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ সমাজে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে। সকলেই তাঁকে সম্মান করে।

আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি আকাইদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে সবসময় নীতি ও উভয় আদর্শের অনুসরণ করে। অন্যায়, অত্যাচার, অশীলতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে। সে কখনো দুর্নীতিকে প্রশংসন দেয় না। বরং সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সে সচেষ্ট হয়।

আকাইদের প্রথম বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অবিতীয় বলে বিশ্বাস করা। তিনি সকল কিছুর স্বষ্টি ও মালিক। তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী ইত্যাদি বিশ্বাস করা। তাওহিদে একপ বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো অনৈতিক কাজ করতে পারে না। কেননা সে জানে যে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাববুল আলামিন। তিনি তাকে সর্বদা দেখছেন এবং তার সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং সে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার হৃকুমমতো জীবনযাপন করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে।

তাওহিদের পরই আসে রিসালাত। রিসালাত হলো নবি-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠজন। তাঁরা নিষ্পাপ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং রিসালাতে বিশ্বাসী মানুষ নবি-রাসূলগণের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁদের ন্যায় সেও উভয় চরিত্র অনুশীলন করে। উন্নত ও অশালীল চলাফেরা ও কথাবার্তা তার থেকে কখনো প্রকাশ পায় না।

আখিরাতে বিশ্বাস আকাইদের অন্যতম অংশ। আখিরাত হলো পরকাল। মানুষের এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর সাথে সাথে আরেক জীবনের শুরু হবে। এরই নাম আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এ জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। দুনিয়াতে যে ভালো ও নেক কাজ করবে আখিরাতে সে চিরশাস্তির জাহানাত লাভ করবে। আর দুনিয়ায় যে অন্যায় ও পাপ কাজ করবে আখিরাতে সে চরম শাস্তির মুখোমুখি হবে, তার ঠিকানা হবে জাহানাম। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে। আখিরাতের সফলতা ও শাস্তির আশায় মানুষ ভালো কাজ করে, সকলের সাথে মিলেমিশে চলে এবং উত্তম চরিত্বান হয়। অন্যদিকে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মানুষ মন্দ ও অশুলীল কাজ পরিত্যাগ করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। এভাবে মানুষ আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে নৈতিকতা অনুশীলন করে থাকে।

অতএব, নৈতিকতা অর্জনে আকাইদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভালোভাবে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। দুনিয়াতে নৈতিকতার অনুশীলন করব, অনেতিক কাজকে কখনোই পছন্দ করব না। তাহলে আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী মিলে তাদের মধ্য থেকে চারজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করবে।

তারা প্রত্যেকে এই পাঠ থেকে কী শিক্ষা পেলো তা আলোচনা করবে আর অন্য সব শিক্ষার্থী শুনবে। পরিশেষে সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি করবে।

নতুন শব্দাবলি

ইলাহ – মারুদ, উপাস্য।

মারুদ – ইবাদতের যোগ্য/ অধিকারী। যার ইবাদত করা হয়।

লা-শারিক – যার কোনো অংশীদার নেই।

দীন – ধর্ম, জীবন বিধান।

আরশ – আল্লাহ তায়ালার আসন।

উম্মত – অনুসারী বা দল। যেমন : আমরা হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত; দল।

দাওয়াত – আহ্বান। আল্লাহ তায়ালা ও দীন ইসলামের দিকে আহ্বানকে দাওয়াত বলা হয়।

অনুশীলনী

বহনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মুজমাল শব্দের অর্থ কী?

- ক) বিশ্বাস
- খ) সংক্ষিপ্ত
- গ) সুন্দরতম
- ঘ) বার্তা

২. আধিরাতে বিশ্বাস মানুষকে—

- i. সমাজে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে
- ii. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে সাহায্য করে
- iii. সত্যবাদি হতে উদ্বৃক্ত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দিগ্কটি গড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নে উত্তর দাও:

‘ক’ ও ‘খ’ দুই বক্তু। ‘ক’ তাদের ক্লাসের মেধাবি শিক্ষার্থী। সে দাবী করে যে সৌরজগতের সকল খবর তার জানা আছে। পৃথিবীতে কখন ভূমিকম্প হবে সে তা বলতে পারবে। তার বক্তু ‘খ’ বাসা থেকে বেশি করে টিফিন নিয়ে এসে গরিব সহপাঠীদের সাথে একসাথে খায়। দুর্বল সহপাঠীদের গড়া শিখিয়ে দেয়। প্রয়োজনে সে তার বই, খাতা, কাগজ ও কলম ধার দিয়ে সহপাঠীদের সাহায্য করে।

৩. উদ্দিগকে ‘ক’ -এর কাজে আসমাইল হসনার কোন বিষয়টি লঙ্ঘন হয়েছে?

- ক) আল্লাহ মালিকুন
- খ) আল্লাহ কারিমুন
- গ) আল্লাহ আলিমুন
- ঘ) আল্লাহ হাকিমুন

৪. ‘খ’ -এর কর্মকাণ্ডের ফলে সে —

- i) সমাজে সম্মানিত হবে
- ii) অনাচার থেকে দূরে থাকবে
- iii) সমাজে প্রভাবশালী হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১)

‘ক’ ও ‘খ’ বার্ষিক পরীক্ষা শেষে তাদের পিতার সাথে সুন্দরবন বেড়াতে গেল। সুন্দরবনের গাছপালা, হরিন ও সমৃদ্ধ তীরের মনোরম দৃশ্যাবলি দেখে মুগ্ধ হয়। তাদের ধারণা প্রকৃতি একা একা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বাবা জনাব ‘গ’ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার দোকানের কর্মচারীদের সাথে হাসি মুখে কথা বলেন। কেউ অপরাধ করলে অথবা কোন জিনিস নষ্ট করলেও কাউকে গালাগালি করেন না। বরং তাদের সংশোধনের সুযোগ দেন।

ক) আকাইদ কী?

- খ) “অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত” আয়াতটি ব্যাখ্যা করো।
- গ) ‘ক’ ও ‘খ’ -এর ধারণা কোন বিশ্বাসের পরিপন্থি? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ) জনাব ‘গ’-এর চরিত্রে আসমাউল হসনার যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত- উত্তর প্রশ্ন

১. ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই’— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
২. আমরা কেন মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবো?
৩. রিসালাতে বিশ্বাস করা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা করো।
৪. ‘আর তাদের সামনে বারযাথ থাকবে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত।’ আয়াতটি ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (الْعِبَادَة)

আল্লাহ তায়ালার দাসত্ত্ব স্বীকার করাকে ইবাদত বলে। আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ, বিধিবিধান মেনে চলার নামই ইবাদত। পরকালের শান্তির জন্য মানুষ সালাত, সাওম ইত্যাদি পালন করে থাকে। দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজ বিস্মিল্লাহ বলে শুরু করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- ইবাদতের ধারণা, তৎপর্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা ও পবিত্র থাকার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- পবিত্র হওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- সালাত (নামায) আদায়ের নিয়মকানুন, সময়সূচি ও সালাতের ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- সালাত (নামায) ভঙ্গের কারণ বর্ণনা করতে পারব;
- সিজদাহ সাহ ও সিজদাহ তিলাওয়াতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- বাস্তব জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্যের শিক্ষা অর্জনে সালাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

ইবাদতের ধারণা ও তাৎপর্য

ইবাদত (عِبَادَة) আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যই হলো ইবাদত। ইসলামি পরিভাষায়-আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদত। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, ইত্যাদি যেমন ইবাদত, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী পালন করাও ইবাদত।

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের লালনপালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমরা তার বান্দা। আমাদের জীবনমরণ তার হাতে। তিনি আমাদের জন্য এ মহাবিশ্বকে কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আসমান জমিন, চাঁদ, সূরজ, ফুল, ফল, নদীনালা সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা সব ভোগ করি। আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করার পর এর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে হবে। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর দেওয়া বিধানমতো চলার নামই ইবাদত। আমরা আল্লাহর আদেশমতো চলব এবং তারই ইবাদত করব।

মহান আল্লাহ সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব স্বীকার করার জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন—

وَمَا خَلَقْتُ أَنْجِنَّ وَالإِنْسَانَ لِلَّيْلَيْغَبْلُونِ

অর্থ : আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি (সূরা আঃ-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)।

মহানবি (স.) ইবাদত সম্পর্কে বলেছেন, ‘যেখানেই থাকে আল্লাহকে ভয় করে চল। আর কখনো কোনো মন্দ কাজ হয়ে গেলে তখনি একটি ভালো কাজ করে ফেল। তাহলে এ কাজটি পূর্ববর্তী মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সাথে উভয় আচরণ কর’ (তিরমিয়ি)।

আমরা ভালো কাজ করব। অন্যকে সৎকাজের পরামর্শ দেবো। এতে উভয়ই সমান সাওয়াব পাব। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পরামর্শ বা সন্দান দেবে, সে ঐ কাজটি সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব পাবে।’ (মুসলিম)। আমাদের জন্য নামায, রোয়া, হজ, যাকাত ইত্যাদি কতগুলো নির্ধারিত ইবাদত রয়েছে। এগুলো নবি করিম (স.) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদেরকে করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব। এভাবে মানুষ তার জীবনকে পরিচালিত করলে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পাবে।

ইবাদতের প্রকারভেদ

ইবাদতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : ১. ইবাদতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদত, ২. ইবাদতে মালি বা আর্থিক ইবাদত, ৩. ইবাদতে মালি ও বাদানি বা শরীর ও অর্থ উভয়ের সংমিশ্রণে ইবাদত। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যজের সাহায্যে যে ইবাদত করা হয় তাকে বলা হয় ইবাদতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদত। যথা— দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ও রম্যান মাসে রোয়া রাখা। ইবাদতের মধ্যে শারীরিক ইবাদত সবচেয়ে বেশি শুরুত্বপূর্ণ। অর্থের দ্বারা যে ইবাদত করতে হয় সেগুলোকে বলা হয় ইবাদতে মালি বা আর্থিক ইবাদত। যেমন : যাকাত দেওয়া, সাদাকা ও দানখয়রাত করা ইত্যাদি। উল্লিখিত দুই প্রকার ইবাদত ছাড়াও এমন কিছু ইবাদত আছে যা শুধু শরীর দ্বারা কিংবা অর্থ দ্বারা করা যায় না। বরং শরীর এবং অর্থ উভয়ের প্রয়োজন হয়; যেমন : হজ করা, জিহাদ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু আমাদের ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তাই সবসময় তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা আমাদের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সবসময় কি ইবাদত করা সম্ভব? হ্যাঁ, দিনরাত চরিশ ঘণ্টা ইবাদত করা সম্ভব। যেমন আমরা খেতে বসলে যদি ‘বিস্মিল্লাহ’ বলে খাওয়া শুরু করি, তবে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকব ততক্ষণ আল্লাহর রহমত পেতে থাকব। এটিই ইবাদত। পড়ার সময় যদি ‘বিস্মিল্লাহ’ বলে পড়া শুরু করি তবে যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব, ততক্ষণই তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। ক্ষুলে যাবার সময় ‘বিস্মিল্লাহ’ বলে যাত্রা শুরু করলে রাস্তার সকল বিপদাপদ থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। একজন অঙ্গলোক রাস্তা পার হতে পারছে না, তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলে তাও আল্লাহর নিকট ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে সবসময় আমরা ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি। ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখময় হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালেও তাদেরকে জাহানামের কঠোর শান্তি ভোগ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার বাইরে আর কোন কোন কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২ নাজাসাত (نَجَّاسَةٌ)

‘নাজাসাত’ আরবি শব্দ। এর অর্থ অপবিত্রতা। এটি তাহারাত বা পবিত্রতার বিপরীত। শরীর থেকে যেসব জিনিস বের হওয়ার কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে যায় অথবা যে সব দ্রব্য কোনো পবিত্র বস্তুতে লাগলে তা অপবিত্র হয়ে যায়, তাকে নাজাসাত বা অপবিত্রতা বলা হয়। যেমন: মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি। নাজাসাতের কারণে শরীর, কাপড় ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র অপবিত্র হয়ে যায়। এ অবস্থায় তা পবিত্র করা একান্ত জরুরি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنَاحًا فَأَطْهِرُوهَا

অর্থ: আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে যাও তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬)।

নাজাসাত বা অপবিত্রতার প্রকারভেদ

নাজাসাত দুই প্রকার। যেমন—

১. নাজাসাতে হাকিকি বা প্রকৃত অপবিত্রতা
২. নাজাসাতে হকমি বা অপ্রকৃত অপবিত্রতা

নাজাসাতে হাকিকি: নাজাসাতে হাকিকি বলতে ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে বোঝায় যেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই অপবিত্র এবং ইসলামি শরিয়ত সেগুলোকে অপবিত্র ঘোষণা করে। ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে মানুষ অপছন্দ করে। যেমন: প্রদ্রাব, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। ইসলাম এসব থেকে শরীরকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

নাজাসাতে হকমি: নাজাসাতে হকমি হচ্ছে ঐ সকল অপবিত্রতা যা দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি বিধানে তা নাজাসাত বা অপবিত্র বলে গণ্য। যেমন-ওয়ু ভঙ্গ হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি। উলেখ্য যে, উভয় প্রকার অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়সমূহ

আলাহ তায়ালা নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি ও পবিত্র বস্তুকে পছন্দ করেন। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জনের উপায়গুলো হলো—

১. ওয়ু: শরীর পবিত্র করার নিয়তে পাক-পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডল, দুই হাত (কনুই সহ) ও দুই পা (টাখনু সহ) ধৌত করা এবং মাথা মাসৃহ করার নাম ওয়ু। যে পানি দিয়ে ওয়ু করা হবে তা অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেমন-নদী, খাল, পুকুর, কৃৎ, বারনা, নলকৃৎ বা শহরে সরবরাহ করা পানি।

২. গোসল: পবিত্র পানি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে পুরো শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীর পবিত্র হয়ে যায়।

৩. তায়ামুম: পানি পাওয়া না গেলে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোগী পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসৃহ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়ামুম বলে।

ইসলাম মনের পবিত্রতার ওপর খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। খ্যাতিমান ইসলামি প্রতিগণ মনের কতিপয় মৌলিক রোগ চিহ্নিত করেছেন। তা হলো লোভ, উচ্চাশা, রাগ, মিথ্যা বলা, গিবত (পরনিন্দা), কার্পণ্য, অহংকার, রিয়া (লোক দেখানো), হাসাদ (হিংসা)। এ পাপগুলো থেকে বেঁচে থাকলে মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ ছাড়া ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে মনের পবিত্রতা অর্জন করা যায়। কোনো মুমিন যদি ইবাদাতের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণ করেন, হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং সদা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করেন তবে তাঁর অন্তর পবিত্র থাকবে। এবার আমরা পবিত্র থাকার লক্ষ্যে ওয়ু, গোসল এবং তায়ামুমের নিয়মগুলো জেনে নেবো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা চার-পাঁচজনের দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দল প্রকৃত অপবিত্রতার ও অপ্রকৃত অপবিত্রতার একটি তালিকা ছেক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩ পবিত্রতা (الْطَّهَارَةُ)

পবিত্রতার আরবি প্রতিশব্দ ‘তাহারাতুন’। ওয়ে, গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। ইবাদতের জন্য পবিত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র না হয়ে নামায আদায় করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘পবিত্রতা ব্যতীত নামায করুল হয় না এবং আত্মাসাতের মাল দ্বারা সাদাকাহ (দান) হয় না’ (মুসলিম)।

পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ থাকে। মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া ও কাজকর্মে মন বসে। আল্লাহ তায়ালা ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

অর্থ : আর উভমুখে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত : ১০৮)।

রাসুলল্লাহ (স.) স্বয়ং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন এবং পবিত্র থাকার জন্য বিশেষভাবে উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘পবিত্রতা ইমানের অংশ’ (মুসলিম)।

পবিত্রতার প্রকারভেদ

পবিত্রতা দুই প্রকার : ১. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, ২. বাহ্যিক পবিত্রতা।

অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা

হৃদয়কে যাবতীয় শিরক, রিয়া, গিবত ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখার নাম অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

বাহ্যিক পবিত্রতা

শরীয়তের বিধিমোতাবেক ওয়ে, গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকে বাহ্যিক পবিত্রতা বলে।

পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মানদণ্ড হচ্ছে শরীয়ত। নিজের জগন-বুদ্ধি বা অভিযোগ অনুযায়ী এ বিষয়ে কিছু কমবেশি করার কারো অধিকার নেই। কেবল সেসব বস্তুই পবিত্র যাকে শরীয়ত পবিত্র বলেছে। আর সেসব বস্তু অপবিত্র যাকে শরীয়ত অপবিত্র বলেছে। সুতরাং শরীয়তের বিধিমোতাবেক পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। নিজের ধ্যানধারণা ও রুচির বশীভূত হয়ে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কোনো মানদণ্ড ঠিক করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো অসুবিধা রাখতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পবিত্র থাকার উপায়গুলো দলীয় আলোচনার পর পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

ওয়ু (الْوُضُوءُ)

ওয়ু আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, উজ্জ্বলতা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়— শরীর পবিত্র করার নিয়মে পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার নামই ওয়ু।

ওয়ুর গুরুত্ব

ওয়ুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

“যারা ইমান এনেছে জেনে রেখো, যখন তোমরা নামায়ের জন্য দাঁড়াবে তার আগে নিজেদের মুখমণ্ডল ধূয়ে নেবে, তোমাদের দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধূয়ে নেবে, মাথা মাসেহ করবে এবং উভয় পা গিরাসহ ধূয়ে নেবে (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)।

ভালোভাবে ওয়ু করলে মন প্রফুল্ল থাকে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ থাকে। ইবাদতেও একাগ্রতা আসে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে চিনতে পারব’ জনেক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি কীভাবে আমাদের চিনবেন?’ নবি করিম (স.) উত্তরে বললেন, ‘ওয়ুর ফলে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় বাক্বাক্ করবে। তাতেই আমি আমার উম্মতকে চিনতে পারব’ (বুখারি ও মুসলিম)। কাজেই ওয়ুর ফজিলত বা মর্যাদা পাওয়ার আশায় আমাদের অতি উত্তমরূপে ওয়ু করতে হবে। ওয়ু পরিপূর্ণ হলে ইমাম ও মুকাদি উভয়ের নামায়ই পরিশুদ্ধ হয়। আর ওয়ু অপরিপূর্ণ হলে নামায়ে পরিপূর্ণতা আসে না।

ওয়ুর নিয়ম

মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে বিস্মিল্লাহ বলে প্রথমে দুই হাত কজি পর্যন্ত ধূয়ে তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। রোয়া না থাকলে তিনবারই গড়গড়া করে কুলি করতে হবে। এরপর নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করতে হবে। তারপর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে চুল পরিমাণ স্থানও শুকনো না থাকে। দাঢ়ি ঘন হলে খিলাল করতে হবে। এরপর দুই হাত কনুইসহ ধৌত করতে হবে। হাতে ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি থাকলে তা নাড়াচাড়া করতে হবে যেন সবখানে পানি পৌছে যায়। তারপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মাসেহ করতে হবে। মাসেহ করার সময় পুরো দুই হাত দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পিছন দিকে ঘাড়সহ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করতে হবে। তারপর দুই হাতের তালু পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করতে হবে। মাসেহ করার পর দুই পা টাখনুসহ ভালো করে ধৌত করতে হবে যাতে একটু জায়গাও বাকি না থাকে। ওয়ুর কাজগুলো পরপর করে যেতে হবে। অর্থাৎ এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করতে হবে। অনেকক্ষণ থেমে থেমে করা যাবে না।

ওয়ুর ফরজ

ওয়ুর ফরজ চারটি। এ চারটির মধ্যে কোনো একটি বাদ পড়লে ওয়ু হবে না।

১. মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা।
২. উভয় হাত কনুইসহ একবার ধোয়া।
৩. মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহ করা।
৪. উভয় পা গিরাসহ একবার ধোয়া।

ওয়ু ভদ্রের কারণ

১. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে।
২. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়াও শরীরের যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো অপবিত্র বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে গেলে (যেমন : রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি)।
৩. থুথু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পুঁজ, খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখভর্তি বমি হলে।
৪. থুথুর সাথে বেশি পরিমাণ রক্ত এলে।
৫. চিত হয়ে, কাত হয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে।
৬. বেহশ হলে।
৭. পাগল হলে।
৮. নেশাগ্রস্ত হলে।
৯. নামাযে অট্টহাসি হাসলে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় ওয়ু করার উপকরণের মাধ্যমে অথবা প্রতীকী উপকরণের সাহায্যে ওয়ু করার নিয়ম অনুশীলন করবে।

পাঠ ৫

তায়াম্বুম (آلشِيْمُ)

তায়াম্বুম আরবি শব্দ। এর অর্থ ইচ্ছা করা। ইসলামি পরিভাষায় পবিত্র মাটি বা ঐ জাতীয় পবিত্র বস্তু (যেমন : পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদি) দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে তায়াম্বুম বলে। তায়াম্বুম ওয়ু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। তায়াম্বুমের মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার অনুমতি উভয়ে মুহাম্মাদির (স.) জন্য আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। বঙ্গত পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত মাধ্যম হলো পানি। আল্লাহ তায়ালা তার বাসদাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে যে, পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি বা প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্বুম করবে এবং তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)

তায়াম্বুমের ফরজ তিনটি। যথা—

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা।
২. পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা।
৩. উভয় হাত পবিত্র মাটি দিয়ে কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্বুম করার নিয়ম

প্রথমে নিয়ত করে ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ পড়বে। তারপর দুই হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পবিত্র মাটি বা ঐ জাতীয় পবিত্র বস্তু; যেমন: পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদিতে দুই হাত লাগিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করবে। পুনরায় দুই হাত মাটিতে লাগিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করবে। হাতে কোনো ঘড়ি বা অন্য কোনো জিনিস থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ করতে হবে।

তায়াম্বুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে ওয়ু ভঙ্গ হয় সেসব কারণে তায়াম্বুমও ভঙ্গ হয়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে তায়াম্বুম ভঙ্গ হয়ে যায়। পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্বুম ভেঙে যায়। কোনো রোগের কারণে তায়াম্বুম করা হলে, সে রোগ দূর হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্বুম ভেঙে যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় তায়াম্বুম করার পদ্ধতি অনুশীলন করবে।

পাঠ ৬

গোসল (الغسل)

‘গোসল’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ধোত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলে।

গোসলের ফরজ

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা—

১. গড়গড়া করে কুলি করা।
২. নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌছানো।
৩. সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া।

গোসলের নিয়ম

প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কজি পর্যন্ত ভালো করে ধোত করতে হবে। তারপর শরীরের কোথাও অপবিত্র বস্ত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ভালোভাবে ওষু করতে হবে। কুলি করার সময় কঞ্চিদেশে এবং নাকের ভিতরে পানি ভালো করে পৌছাতে হবে। ওষুর পর মাথায় এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছে যায়। এরপর ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ধোত করতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে। সর্বশেষে পা ধুতে হবে। এরপর সমস্ত শরীর কোনো কাপড় বা গামছা দিয়ে মুছে শুকনো কাপড় পরতে হবে।

কাজ : ‘পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে গোসল।’

এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে দলে ভাগ হয়ে বিতর্ক করবে।

পাঠ ৭

সালাত (الصلوة)

‘সালাত’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আরকান আহকামসহ বিশেষ নিয়ম ও নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইবাদতের নাম সালাত বা নামায। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে নামায। ইসলামের পাঁচটি রূক্ণ বা স্তুপের মধ্যে নামায দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রূক্ণ। হাদিসে আছে, ‘ইসলাম পাঁচটি স্তুপের উপর প্রতিষ্ঠিত: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মারুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তার (আল্লাহ তায়ালার) বান্দা ও রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমজান মাসে রোমা রাখা’ (বুখারি ও মুসলিম)।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الرِّزْكَوَةَ

অর্থ: আরতোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)।

নামায মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে ঘোষণা করেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ: নিচয়ই নামায মানুষকে অশ্রীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা আল-আনকাবৃত, আয়াত: ৪৫)।

নামায আদায়কারী দুনিয়াতে মর্যাদা পাবে। আধিরাতে পাবে জালাত। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘সালাত বেহেশতের চাবি’ (তিরমিয়ি)। কারো হাতে কোনো ঘরের চাবি থাকলে যেমন অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে অতি সহজেই জালাতে প্রবেশ করতে পারবে। নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামাযের মাধ্যমে মুমিনের গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘এ কথার মধ্যে তোমাদের কী মত? যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি প্রবাহিত নদী থাকে, যার মধ্যে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। তাহলে তার দেহে কোনো ময়লা বাকি থাকবে কি?’ সাহাবিগণ (রা.) বললেন, ‘তার কোনো ময়লা বাকি থাকবে না।’ তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ‘এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ যা দ্বারা যাবতীয় গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়’ (বুখারি ও মুসলিম)।

মহানবি (স.) আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নূর, দলিল ও নাজাত হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নূর, দলিল ও নাজাত হবে না। তার হাশর হবে কারুণ, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সঙ্গে’ (আহমাদ ও দারিনি)।

এছাড়াও নামাযের আরও কতিপয় গুরুত্ব রয়েছে যা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হলো :

- ইসলামে ইমানের পরই নামাযের স্থান।
- স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করা কুফর।
- নামায দীন ইসলামের খুঁটিরূপ।
- মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সর্বশেষ উপদেশ ছিল নামায ও নারীজাতি সম্পর্কে।

কাজ : ‘একজন মানুষ নামাযি হতে পরিবারই মুখ্য ভূমিকা রাখে’ এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করবে।

পাঠ ৮

সালাতের সময়সূচি (أوقات الصلاة)

যথাসময়ে সালাত আদায় করা আল্লাহর আদেশ। সময়মতো সালাত আদায় করা ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

○ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتًا ○

অর্থ: নির্ধারিত সময়ে সালাত কার্যম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (সূরা আল-নিসা, আয়াত : ১০৩)।

সালাতের সময়

ফজর : ফজরের সালাতের সময় আরাঞ্জ হয় সুবহে সাদিকে হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বমান যে আলোর রেখা দেখা দেয় তাকেই বলে সুবহে সাদিক। আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সূর্যোদয় ঘটে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজর সালাতের সময়’ (মুসলিম)।

যোহর : দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যোহরের সময় শুরু হয়। প্রত্যেক বন্তর ছায়া ‘ছায়া আসলি’ বাদ দিয়ে দিগ্নে হওয়া পর্যন্ত এই সময় থাকে। কোনো বন্তর ঠিক দুপুরের সময়ে যে একটু ছায়া থাকে তাকেই ‘ছায়া আসলি’ বা আসল ছায়া বলে। যেমন এক হাত লম্বা একটি কাঠির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙুল ছিল। তারপর ঐ কাঠির ছায়া যখন দুই হাত চার আঙুল হবে তখন যোহরের সময় শেষ হয়ে যাবে (তিরমিয়ি)।

আসর : যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলে আসরের সালাত আদায় করা মাকরহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তোমরা সালাতের অতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৮)।

মাগরিব : সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকে ততক্ষণ সময় থাকে। মাগরিবের সময় খুবই কম। তাই সময় হওয়ার সাথে সাথেই সালাত আদায় করে নেওয়া উত্তম।

এশা : মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর এশার সালাতের সময় শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যে এশার সালাত আদায় করা উত্তম। রাত দ্বিপ্রহরের পর আদায় করা মাকরহ।

বিতর : বিতর-এর আসল সময় শেষরাত। তবে এশার সালাতের সাথেও আদায় করা যায়। কিন্তু এশার আগে পড়া যায় না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ‘সালাত আদায় অত্যাবশ্যক কেন’ এ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লিখে
শিফককে দেখাবে।

পাঠ ৯ সালাত আদায়ের নিয়ম

গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাত মহানবি (স.) প্রদর্শিত পছায় আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘তোমরা সালাত আদায় কর যেমনিভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ’ (বুখারি)।

কোনো অকার ভুল হলে সালাতের ক্ষতি হয়। এতে বান্দার ফ্লাহ হয়। বিনীত ও একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। লোকদেখানো কিংবা উদাসীনভাবে আদায়কৃত সালাত আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন—

“সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাত সম্মতে উদাসীন, যারা লোকদেখানোর জন্য ওটা (সালাত) আদায় করে” (সূরা আল-মাউন, আয়াত : ৪-৬)।

সালাত আদায়কালে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সালাতের শর্তগুলোর কোনোটাই যেন বাদ না পড়ে। পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

দুই, তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট নামায আদায়ের নিয়মে কিছুটা তারতম্য আছে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হলো:

দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে নিয়ত করে দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলে ‘আল্লাহ আকবার’ বলে নাভির নিচে হাত বাঁধব। তবে নারীগণ হাত তুলবে কাঁধ পর্যন্ত এবং বাম হাতের পিঠের ওপর ডান হাত রেখে বুকের উপর হাত বাঁধব। নিয়ত মনে মনে করলেই চলবে। তবে মুখে উচ্চারণ করা উভয়। এরপর ‘সানা’ পড়ব। এরপর ‘আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজি’ন, বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। ফাতিহা পড়ে মনে মনে ‘আমিন’ বলব। এরপর অন্য কোনো সূরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি সূরা পড়ব। তারপর ‘আল্লাহ আকবার’ বলে রুকু করব। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার ‘সুবহানা রাবিয়াল আযিম’ বলব। তারপর ‘সামি আল্লাহলিমান হামিদাহ’ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় ‘রাববানা লাকাল হাম্দ’ বলব। তারপর ‘আল্লাহ আকবার’ বলে সোজা হয়ে বসব। সিজদায় অন্তত তিনবার ‘সুবহানা রাবিয়াল আ’লা’ বলব। তারপর ‘আল্লাহ আকবার’ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এবারও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার ‘সুবহানা রাবিয়াল আ’লা’ বলব। এরপর ‘আল্লাহ আকবার’ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে। এখন দ্বিতীয় রাকআত শুরু হলো। ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর পূর্বের মতো সূরা মিলাব। তারপর প্রথম রাকআতের মতো রুকু ও সিজদাহ করে সোজা হয়ে বসব। তাশাহহুদ, দরুন্দ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে ‘আস্মালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলব। এইভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট নামায শেষ হবে।

তিন রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের পর বসা অবস্থায় শুধু তাশাহহুদ পড়ব। তারপর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। অন্য কোনো সূরা পড়ব না। এরপর পূর্বের মতো রুকু, সিজদাহ করব। সিজদাহ পর সোজা হয়ে বসে তাশাহহুদ, দরুন্দ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব।

চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের পর বসা অবস্থায় শুধু তাশাহহুদ পড়ব। পরে তৃতীয় রাকআতের জন্য তাকবির বলে উঠে দাঁড়াব। এরপর বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর রুকু-সিজদাহ করে, চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াব। চতুর্থ রাকআতে তৃতীয় রাকআতের মতো সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু, সিজদাহ করার পর বসে তাশাহহুদ, দরুন্দ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব। ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল নামায হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই উপকরণের মাধ্যমে নামায আদায়ের নিয়ম শ্রেণিতে অনুশীলন করবে। শিক্ষক মহোদয় সহযোগিতা করবেন।

পাঠ ১০

সালাতের ফরজ (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

সালাত (নামায) সহিত বা শুক্র হওয়ার জন্য কতগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে। যার কোনো একটি ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। সালাতে মোট ফরজ তেরোটি। সালাতের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সাতটি ফরজ রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আহকাম বলা হয়।

১. শরীর পরিত্র হওয়া।
২. পরিধানের কাপড় পরিত্র হওয়া।
৩. সালাতের স্থান পরিত্র হওয়া। কমপক্ষে দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সিজদাহুর জায়গা পর্যন্ত পরিত্র হতে হবে।
৪. সতর ঢাকা। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের মুখমণ্ডল, দুই হাতের কঙ্গি, পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।
৫. কিবলামুখী হওয়া। কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। কিবলা অজানা অবস্থায় অথবা জানার কোনো উপায় না থাকলে নিজের থবল ধারণা অনুযায়ী কিবলা নির্ধারণ করে সালাত আদায় করবে।
৬. সালাতের সময় হওয়া।
৭. নিয়ত করা। যে ওয়াকের সালাত আদায় করবে মনে মনে সেই ওয়াকের সালাতের নিয়ত করা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষায় নিয়ত করতে পারবে।

সালাতের ভিতরে ছয়টি ফরজ রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়।

১. তাকবিরে তাহরিমা বা আল্লাহ আকবার বলে সালাত আরস্ত করা।
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে এবং বসতে সক্ষম না হলে শয়নাবস্থায় ইশারায় সালাত আদায় করতে হবে।
৩. সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করা।
৪. ঝুকু করা।
৫. সিজদাহ করা।
৬. শেষ বৈঠক। যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহুদ, দরজ ও দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হয় তাকেই শেষ বৈঠক বলে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সালাতের আহকাম ও আরকানের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম পোস্টার পেপারে লিখবে।
এরপর শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের ওয়াজিব

নামাযের ওয়াজিব বলতে এমন সব জরুরি বিষয় বোঝায় যার কোনো একটি ভুলবশত ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা নামায শুন্দি করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ (ফাসিদ) হয়ে যায় এবং পুনরায় নামায আদায় করতে হয়।

নামাযের ওয়াজিব চৌদ্দটি। এগুলো নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।
২. সূরা ফাতিহার সাথে কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা। অর্থাৎ আয়াত ছোট হলে কমপক্ষে তিনটি আয়াত এবং বড় হলে কমপক্ষে একটি আয়াত পাঠ করা।
৩. রংকু, সিজদাহ ও তিলাওয়াতের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।
৪. নামাযের রংকণগুলো সঠিকভাবে আদায় করা।
৫. রংকু করার পর সোজা হয়ে দাঢ়ানো।
৬. দুই সিজদাহর মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৭. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকআত পড়ার পর তাশাহুদ পড়ার জন্য বসা।
৮. তাশাহুদ পাঠ করা।
৯. ইমামের জন্য উচ্চেষ্ট্রে তিলাওয়াতের স্থলে উচ্চেষ্ট্রে এবং চুপে চুপে তিলাওয়াতের স্থলে চুপে চুপে তিলাওয়াত করা।
১০. বিতর নামাযে দোয়া কুনুত পাঠ করা।
১১. নামাযের মধ্যে সিজদাহর আয়াত পড়লে তিলাওয়াতে সিজদাহ করা।
১২. সিজদাহর মধ্যে উভয় হাত ও হাঁটু মাটিতে রাখা।
১৩. দুই ঈদে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।
১৪. আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ বলে নামায শেষ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক দল সালাতের ওয়াজিবগুলোর নাম পোস্টার পেপারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের সুন্নত

রাসুলুল্লাহ (স.) নামায়ের মধ্যে ফরজ ওয়াজির ছাড়াও কিছু আমল বা কাজ করেছেন কিন্তু এগুলো আদায়ের ব্যাপারে ফরজ ওয়াজিরের ন্যায় তাগিদ করেননি। এগুলোকে বলা হয় সুন্নত। যদিও এগুলো ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয় না কিংবা সাহ সিজদাহ দিতে হয় না, তথাপি এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ রাসুলুল্লাহ (স.) এভাবে নামায আদায় করেছেন এবং অন্যকেও আদায় করতে বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘তোমরা নামায আদায় কর, যেমনিভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখেছ’ (বুখারি)।

সালাতের অনেকগুলো সুন্নত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ—

১. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় পুরুষের কানের লতি ও নারীদের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠানো।
২. তাকবির বলার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো খুলে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা।
৩. নিয়ত করার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
৪. তাকবির তাহরিমা বলার সময় মাথা অবনত না করা।
৫. ইমামের জন্য জোরে তাকবির বলা।
৬. সানা পড়া।
৭. আউয়ুবিল্লাহ পড়া।
৮. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে মনে মনে বিস্মিল্লাহ পড়া।
৯. ফরজ নামাযের তৃতীয়, চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।
১০. ফাতিহার পর আমিন বলা।
১১. সানা, আউয়ুবিল্লাহ, আমিন আন্তে বলা।
১২. এক রুকু থেকে অন্য রুকুনে যাওয়ার সময় তাকবির বলা।
১৩. রুকু এবং সিজদায় তাসবিহ পড়া।
১৪. রুকুতে মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দুই হাতের আঙুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা।
১৫. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের ‘সামি আল্লাহলিমান হামিদাহ’ ও মুকাদির ‘রাববানা লাকাল হাম্দ’ বলা।
১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সর্বশেষ কপাল মাটিতে রাখা।
১৭. বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা।
১৮. তাশাহুদে লা-ইলাহা এর ‘লা’ উচ্চারণের সময় শাহাদাত আঙুল উঠানো।
১৯. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরজ পড়া।
২০. দরজের পর দোয়া মাসুরা বা এই জাতীয় কোনো দোয়া পড়া।
২১. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফেরানো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এবং প্রত্যেক দল নামাযের সুন্নতগুলো পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের মুস্তাহাব

নামাযে এমন কিছু কাজ আছে যা মেনে চললে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না। এগুলোকে বলা হয় মুস্তাহাব। নামাযের কতিপয় মুস্তাহাব নিচে দেওয়া হলো :

১. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদাহর স্থানে দৃষ্টি রাখা।
২. রুকুর সময় পায়ের উপর, সিজদাহর সময় নাকের উপর এবং বসা অস্থায় কোলের উপর দৃষ্টি রাখা।
৩. হাঁচি এলে, হাই উঠলে, কাশি এলে যথাসম্ভব চেপে রাখার চেষ্টা করা।
৪. ধীরস্থিরভাবে কুরআন পাঠ করা।
৫. সিজদাহর সময় উভয় হাতের মধ্যস্থানে মাথা রাখা।
৬. মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা পাঠ করা।
৭. একা একা নামায আদায়কালে রুকু, সিজদায় তাসবিহ তিনবারের বেশি (পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি) পড়া।

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণ

নামাযের শুরুতে আমরা নিয়ত করে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে হাত বাঁধি, একে বলা হয় তাকবিরে তাহরিমা। এই তাকবির বলার পর অন্য কোনো কাজ বা কথা বলা হারাম হয়ে যায়। যদি কেউ এমন করে ফেলে তবে নামায বাতিল হবে। কী কী কাজ করলে নামায ভঙ্গে যায় তা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. নামাযের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে এবং সালামের উভয় দিলে।
২. নামাযের মধ্যে কথা বললে।
৩. কিছু খেলে।
৪. কিছু পান করলে।
৫. শব্দ করে হাসলে।
৬. বিপদ বা কষ্টের কারণে উচ্চেঁহরে কাঁদলে।
৭. ব্যথা বা রোগের কারণে উহু আহ এরূপ শব্দ করলে।
৮. কুরআন মজিদ দেখে পড়লে।
৯. কিবলার দিক থেকে সীলা ঘুরালে।
১০. দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করলে।
১১. মুক্তাদি ইমাম অপেক্ষা সামনে দাঁড়ালে।
১২. অপবিত্র স্থানে সিজদাহ করলে।
১৩. দুনিয়ার কোনো কিছু প্রার্থনা করলে।
১৪. বিনা কারণে বারবার কাশি দিলে।
১৫. নামাযের কোনো ফরজ বাদ গেলে।
১৬. কোনো সুসংবাদে ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ বললে।
১৭. কোনো দুঃসংবাদে ‘ইল্লাল্লাহ্’ বললে।
১৮. হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ বললে।
১৯. হাঁচির উভয়ে ‘ইয়ারহাম্মাকাল্লাহ্’ বললে।
২০. নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে।
২১. আমলে কাসির করলে (এমন কাজ করা যা দেখলে মানুষ মনে করবে, সে নামায পড়ছে না)।

সালাত মাকরহ হওয়ার কারণ

এমন কিছু কাজ আছে যা করলে নামায নষ্ট না হলেও সাওয়াব কর হয়, সেগুলো সালাতের মাকরহ কাজ। নিম্নে এমন কতগুলো কাজের কথা উল্লেখ করা হলো :

১. নামাযে বিনা কারণে আঙ্গুল মটকানো।
২. আলসেমি করে খালি মাথায় নামায আদায় করা।
৩. কাপড় ধুলাবালি থেকে বাঁচানোর জন্য গুটিয়ে নেওয়া।
৪. পরনের কাপড়, বোতাম, দাঢ়ি ইত্যাদি অহেতুক নাড়াচাড়া করা।
৫. ময়লা ও অশালীন পোশাক পরে নামায আদায় করা।
৬. প্রস্তাব-পায়খানা চেপে রেখে নামায আদায় করা।
৭. নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো।
৮. সিজদায় দুই হাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া।
৯. ইমামের মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো।
১০. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরা।
১১. আগের কাতারে জায়গা থাকলেও একাকী পিছনে দাঁড়ানো।
১২. ইশারায় সালাম করা।
১৩. শুধু কপাল অথবা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করা।
১৪. বিনা কারণে শুধু ইমামের উচুস্থানে দাঁড়ানো।
১৫. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা।
১৬. চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা।
১৭. তিলাওয়াত পূর্ণ না করেই রংকুর জন্য ঝুঁকে পড়া।
১৮. সিজদাহর সময় পা মাটি থেকে উপরে উঠানো।
১৯. নামাযে আয়ত, তাসবিহ আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা।
২০. তিলাওয়াতে অসুবিধা হয় মুখে এমন কোনো জিনিস রাখা।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিনি সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ : ১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। ২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। ৩. সূর্যাস্তের সময়, তবে কোনো কারণে ঐ দিনের আসরের নামায আদায় করা না হলে তা এই সময় আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরহ হবে।

সালাতের মাকরহ সময়

১. ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। ২. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৩. ফজরের সময় হলে ঐ সময়ের সুন্নত ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া। ৪. ফরজ নামাযের জন্য যখন তাকবির দেওয়া হয় তখন অন্য নামায শুরু করা। ৫. যখন ইমাম জুমুআর খুতবা দিতে থাকেন তখন কোনো নামায শুরু করা। ৬. এশার নামায মধ্যরাতের পরে পড়া।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

সিজদাহ্ (سجّدَ)

‘সিজদাহ্’ আরবি শব্দ। এর অর্থ মাথা অবনতকরণ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বান্দা তার কপাল জমিনে রাখাকে সিজদাহ্ বলে।

সিজদাহ্র প্রকারভেদ

ফরজ সিজদাহ্: মানুষ নামায আদায়ের সময় যেসব সিজদাহ্ দিয়ে থাকে তাকে ফরজ সিজদাহ্ বলে।

ওয়াজিব সিজদাহ্: ভূলবশত নামাযে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে এবং সিজদাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করলে যে সিজদাহ্ দিতে হয় তাকে ওয়াজিব সিজদাহ্ বলে।

মুস্তাহাব সিজদাহ্: কোনো নিয়মতপ্রাপ্ত হলে, বিপদমুক্ত হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যে সিজদাহ্ দেওয়া হয় তাকে মুস্তাহাব সিজদাহ্ বলে।

সিজদায়ে সাহ্: সিজদায়ে সাহ্ অর্থ ভূলের জন্য সিজদাহ্। ভূলবশত নামাযে ওয়াজিব বাদ পড়লে, তা সংশোধনের জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে দুটি সিজদাহ্ করা হয়, একেই সিজদায়ে সাহ্ বলে।

সিজদায়ে সাহ্ আদায় করার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফেরাব। তারপর ‘আল্লাহ আকবার’ বলে নামাযের সিজদাহ্র ন্যায় দুটি সিজদাহ্ করে তাশাহুদ, দরজ্দ ও দোয়া মাসূরা পড়ব। তারপর দুইদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব। সিজদায়ে সাহ্ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, ‘আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভূলে যাও, আমিও তেমনি ভূলে যাই। সুতরাং যখন আমি ভূলে যাব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহ করবে তখন সে গভীর চিন্তা করে সঠিক বিষয়টি ঠিক করে নেবে। অতঃপর এর উপর ভিত্তি করে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম দিয়ে দুটি সিজদাহ্ করবে’(বুখারি ও মুসলিম)।

সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. ভূলবশত নামাযের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে।
২. নামাযের কাজগুলো পরপর আদায় করতে বিলম্ব করলে (যেমন: সূরা ফাতিহা পড়ার পর চূপ করে থাকলে, কিছুক্ষণ চূপ থাকার পর কোনো সূরা পড়লে)।
৩. কোনো ফরজ আদায় করতে বিলম্ব হলে।
৪. নামায আদায়ে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম হলে (যেমন: রুকুর আগেই সিজদাহ্ করলে)।
৫. কোনো ফরজ একবারের হলে একাধিকবার করলে।
৬. কোনো ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করলে (যেমন: সরবে তিলাওয়াতের স্থলে নীরবে এবং নীরবে তিলাওয়াতের স্থলে সরবে পড়লে)।

মনে রাখা দরকার, প্রথম বৈঠক করতে ভূলে গেলে যদি দাঁড়ানোর পূর্বেই মনে পড়ে তাহলে বসে যাব এবং বৈঠক পূর্ণ করব। আর যদি দাঁড়ানোর পর মনে পড়ে তাহলে বসব না। নামায শেষে সাহ্ সিজদাহ্ করব।

পাঠ ১২

সিজদায়ে তিলাওয়াত (سَجَدَةُ التِّلَاوَةِ)

পবিত্র কুরআন মজিদে কতগুলো আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ্ করা জরুরি। সিজদাহ্ আদায় না করলে গুনহগার হবে। হাদিসে আছে, ‘যখন কেউ সিজদাহ্ আয়াত পড়ে সিজদাহ্ করে তখন শয়তান একগাশে বসে বিলাপ করতে থাকে এবং বলে, হায় আফসোস! আদম সত্তানদের সিজদাহ্ হুকুম দেওয়া হলো, তারা সিজদাহ্ করল এবং জান্নাতের দাবিদার হলো। আর আমাকে সিজদাহ্ হুকুম দেওয়া হলো আমি অস্বীকার করে জাহান্নামি হলাম’ (মুসলিম)।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করে ‘আল্লাহ আকবার’ বলে সিজদাহ্ করতে হয়। সিজদাহ্ করার পর ‘আল্লাহ আকবার’ বলে উঠে দাঁড়াতে হয়। তাশাহুদ পড়া ও সালাম ফেরানোর প্রয়োজন নেই। সিজদায়ে তিলাওয়াতে একটি সিজদাহ্ করলেই চলবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের চারটি শর্ত

১. তাহারাত অর্থাৎ পবিত্র হওয়া।
২. সতর ঢাকা।
৩. কিবলামুখী হওয়া।
৪. সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করা।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান

১. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ২০৬।
২. সূরা রাদ, আয়াত : ১৫।
৩. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৫০।
৪. সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১০৯।
৫. সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৮।
৬. সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ১৮, ৭৭।
৭. সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৬০।
৮. সূরা আন-নামল, আয়াত : ২৬।
৯. সূরা সাজদাহ্, আয়াত : ১৫।
১০. সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৪।
১১. সূরা হা-মীম-আস্-সাজদাহ্, আয়াত : ৩৮।
১২. সূরা আন-নাজ্ম, আয়াত : ৬২।
১৩. সূরা আল-ইন্শিকাক, আয়াত : ২১।
১৪. সূরা আল-আলাক, আয়াত : ১৯।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সূরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থানসমূহ ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩

সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত (নামায) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর সাথে নৈতিকতা বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। ইসলামি বিধান অনুযায়ী নামায আদায় করলে একে তো আল্লাহর আইন পালন করা হয়, অপরদিকে বান্দার পার্থিব জীবনেও নৈতিকতার উন্নতি ঘটে। আর কোনো মানুষের নৈতিকতার উন্নতি ঘটলে, দুনিয়াতে যেমনি পাবে সম্মান ও মর্যাদা তেমনি পরকালেও পাবে সুখ-শান্তি।

নিচে নামাযের কতিপয় নৈতিক বিষয় বর্ণনা করা হলো :

পরিকার-পরিচ্ছন্নতা

নামায আদায়কারীকে পরিকার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে একজন মুমিন যখন নামায আদায় করবে তখন তাকে অবশ্যই ওয়ু করতে হয়। আর নামাযের পূর্বশর্তসমূহের একটি হলো পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهِرُوا

অর্থ : আর যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে পবিত্রতা অর্জন কর (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)।

নামাযের আগে রাসুলুল্লাহ (স.) মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যথানিয়মে দাঁত পরিকার করলে মুখে দুর্গন্ধ থাকে না। রোগের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তিনি বলেন, ‘আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হলে আমি তাদের প্রতি নামাযে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম’ (ইবনু মাজাহ)।

নামায আদায় করতে হলে দৈনিক পাঁচবার ওয়ু করতে হয় যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় অঙ্গকে পরিকার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করে। এটা নাক, মুখ, চোখ, দাঁত ও পোশাক-পরিচ্ছন্ন পরিকার রাখার অতুলনীয় কৌশলও বটে। যদি মুসল্লির শরীর, জামাকাপড় ইত্যাদি পরিকার-পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে অন্য মুসল্লির কষ্ট হয় না। বরং সুন্দর ও সুস্থ মন নিয়ে একে অপরের সাথে দাঁড়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পরিকার-পরিচ্ছন্নতার এ শিক্ষা নামায থেকেই পাওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দল পরিকার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনে সালাতের ভূমিকা বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সময়ানুবর্তিতা

নামায নিয়মানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠা শিক্ষা দেয়। একজন মুমিন ব্যক্তিকে দৈনিক পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করতে হয়। এতে সে সময়ের প্রতি সচেতন হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে জামাআতে নামায অনুষ্ঠিত হয়। কোনো ব্যক্তি সময়মতো জামাআতে নামায আদায় করতে না পারলে সে জামাআতের সাওয়াব হতে বাধ্যতা হবে। কিছু সময় পরই নামায আদায় করতে হয় বলে সময়কে শিখিল করা যায় না। বরং সবসময়ই নামাযের আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য মুমিন ব্যক্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয়। পরিত্ব কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝

অর্থ : নিচয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১০৩)।

প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে জামাআতে নামায আদায় করা মুমিন বান্দাকে সময়নিষ্ঠ হতে এবং সময়ের প্রতি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে উত্তুন্দ করে। অকারণে তিনি সময় নষ্ট করেন না। সমাজের অপরাপর লোকের সাথে সময়মতো কর্তব্য কাজে অভ্যন্ত হন।

এতে সে জীবনের সব কাজেই সময়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। আজকের শিশু আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। প্রত্যেক মুসলিম দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের মাধ্যমে সময়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপ্রাপ্ত হলে সে অবশ্যই একটি জাতির অঙ্গ মানবসম্পদে পরিণত হবে। সময়মতো নামায আদায় করার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার কর্মসূলে যথাসময়ে কর্তব্য পালনের শিক্ষা গ্রহণ করবে। সে কোনো কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখবে না। বরং যথাসময়ে কঠোর পরিশ্রমে ঐ কাজ সম্পন্ন করবে। দেশের সেনাবিভাগ কঠোর সময়ানুবর্তিতার দিকে মনোনিবেশ করে। এ বিভাগে কর্তব্যরত সৈনিকগণকে নির্ধারিত সময়ে বিউগল বেজে উঠলে শয্যা ত্যাগ করে ইউনিফর্ম পরিধান করে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ বা কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। দেশ রক্ষা ও শক্রদের সন্ত্বার্য আক্রমণের মোকাবিলার জন্যই সৈন্যদেরকে একপ শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ তাদের জীবনে একপ দুঃসময় নাও আসতে পারে। কিন্তু মুসলিমগণ অবিরত তাদের কর্তব্য পালনে নিরোজিত। তাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অসৎ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। মহান আল্লাহর দৈনিক পাঁচবার তাঁর মুমিন বান্দাকে আয়ানের মাধ্যমে নামাযের আহবান জানান। এ আহবানে আল্লাহর সৈনিকগণ দৌড়ে আসবে এবং প্রমাণ করবে, সবসময় ও সকল অবস্থায় তারা আল্লাহর হৃকুম পালনে প্রস্তুত।

কাজ : ‘সময়ানুবর্তিতাই মানুষের ইহজীবনে সম্মান বাঢ়ায়’ – এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে।

শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা মানে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অপরিসীম। রাস্তাধাটে যানবাহন চালনায় চালককে যেমন একটি বিশেষ নিয়ম মানতে হয়। আর এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তেমনি মানুষের জীবনও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির অধীনে আবদ্ধ। বিশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনা করলে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আর যদি সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনা করে তাহলে নিজে যেমন উপকৃত হবে তেমনি সমাজের অন্য ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। শৃঙ্খলার এই শিক্ষা নামায থেকেই পাওয়া যায়।

নামাযে একাকী হোক আর জামাআতবদ্ধ হোক বান্দাকে এক কিবলার দিকেই মুখ ফেরাতে হয়। একই সময়ে নির্দিষ্ট নামায আদায়ের জন্য একই ইমামের পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। এভাবে নামায আদায়ের ফলে মুমিনের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ, নেতার প্রতি আনুগত্যবোধ গড়ে ওঠে। সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, সকলে মিলেমিশে মীমাংসা করার শিক্ষা নামাযের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

কাজ : নামায আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ তার কর্মসূলেও সুশৃঙ্খল হয়, এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

একাগ্রতা

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা। নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকট তার আবেদন নিবেদন পেশ করে তৃষ্ণি লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালাও বান্দার আবেদন গ্রহণ করে থাকেন। তাহলে বান্দাকে অবশ্যই বিনয়ের সাথে নামাযে দাঁড়াতে হবে। যেমন :
কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

“তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৮)।

নামায অবস্থায় বান্দার মন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে অথচ নামাযি টেরও পায় না। কারণ, মানব মন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে অভ্যন্ত। গভীর মনোযোগের সাথে কোনো কাজে নিয়োজিত না হলে মন স্থির থাকে না। তাছাড়া শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শক্তি। সে বান্দার সকল ইবাদত বিশেষত নামায নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিষয় মনের মধ্যে হাজির করে দেয়। তাই বান্দার মন নামাযে ঠিক থাকে না। এজন্যই বান্দাকে খুশ খুয়ু (বিনয় ও একাগ্রতা) ও মনের স্থিরতার সাথে নামায আদায় করতে হবে। যেমন পরিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন “মুমিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী” (সূরা আল-মু’মিনুন, আয়াত : ১, ২)।

কাজ : ‘একাগ্রতা হচ্ছে নামায করুল হওয়ার একমাত্র উপায়।’ শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

নিয়মানুবর্তিতা

নামায মানুষকে নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে প্রশিক্ষণের মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষ যা অর্জন করে তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. মানুষ তার প্রভুর কর্তব্য পালনে অভ্যন্ত হয়।
২. সমাজে কে অনুগত আর কে বিদ্রোহী নামায তা নির্ধারণ করে দেয়।
৩. মানুষকে ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে সাহায্য করে।
৪. এটি বান্দার চারিত্রিক শক্তিকে আরও দৃঢ় করে।

নামায মানব চরিত্রের দুর্বলতা দূর করে। সাত বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের নামাযের তাগিদ দিতে বলা হয়েছে। এতে তারা শিখিলতা করলে দশ বছর বয়সে তাদের প্রহার করে নামাযে অভ্যন্ত করে তোলার নির্দেশ রয়েছে। নামায আদায়ের দায়িত্ব হতে কেউ রেহাই পায় না। নামাযের সময় হলে সকল মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় নামায আদায় করতে বাধ্য।

যে ব্যক্তি নিয়মনীতি মেনে, সময়নিষ্ঠ হয়ে একাথ্রতার সাথে নামায আদায় করবে, সে অবশ্যই হবে একজন দায়িত্ব সচেতন, সুশৃঙ্খল ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এমন ব্যক্তি সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সাম্য

জামাআতে নামায আদায়কারী মুসলিমগণ মসজিদে একত্র হয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়। সকল মুক্তাদিই ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। তখন ধনী-গরিব, আমির-ফকির, শাসক-শাসিত, ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ থাকে না। মসজিদে ইমাম মুয়ায়্যিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য স্থান নির্ধারিত থাকে না। এটি ইসলামি ভাতৃত্ব ও সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক। সমাজে পরম্পর পরম্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। সামাজিক যেকোনো সমস্যা সমাধানে একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসে এবং শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে সক্ষম হয়।

সাম্য ও ভাতৃত্ববোধের এ শিক্ষা একজন মুমিনকে সমাজের অন্য ধর্মবলব্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, দায়িত্বশীল ও সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। এতে সমাজে ছোটো-বড়ো, ধনী-গরিব শ্রেণিবৈষম্য ইত্যাদি দূর হয় এবং অঙ্গুলীয় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এর ফলেই সমাজে কোনো রকম কলহ-বিবাদ থাকতে পারে না। বরং প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আদর্শ সমাজ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে নামায থেকে নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্যের যেসব শিক্ষা পাওয়া যায়—তার তালিকা প্রণয়ন করবে।

অনুশীলনী

বহনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ওয়ু ভঙ্গের কারণ কোনটি ?

- ক) গোসল ওয়াজিব হলে
- খ) পানি পাওয়ার সাথে সাথে
- গ) থুথুর সাথে বেশি পরিমাণ রক্ত এলে
- ঘ) কোনো রোগ দূর হওয়ার সাথে সাথে

২. সিজদায়ে সাহ ওয়াজিব হওয়ার কারণ-

- i) নামায আদায়ে ধারাবাহিকতা মেনে না চলা
- ii) অনিষ্টাকৃত কোনো ওয়াজিব বাদ পড়া
- iii) কোন ফরজ আদায় না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

‘ক’ ও ‘খ’ দুই বক্তু। তারা গ্রীষ্মের ছুটিতে কোন এক পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে গিয়ে একটি পাহাড়ের চুড়ায় উঠলেন, তখন আছরের সময় হয়ে গেছে কিন্তু পাহাড়ে কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিলনা। তখন ‘ক’ এক টুকরা মাটি নিয়ে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করলেন। পক্ষান্তরে, তার বক্তু ‘খ’ পানি বা মাটি ব্যবহার না করেই সালাত আদায় করলেন।

৩. ‘ক’ - কী করে সালাত আদায় করলেন?

- ক) ওয়
- খ) তায়াম্বুম
- গ) তাহরাত
- ঘ) সিজদায়ে সাহ

৪. ‘খ’- এর কর্মকাণ্ডে-

- i) সালাতের ফরজ লঙ্ঘন হয়েছে
- ii) সালাতের ওয়াজিব লঙ্ঘন হয়েছে
- iii) সালাতের আহকাম লঙ্ঘন হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন:

১)

জনাব ‘ক’ প্রতিদিন আয়ান হলেই নামায আদায় করেন। রমজান মাসে পুরো সময় রোজা রাখেন। জনাব ‘ক’ এর বন্ধু জনাব ‘খ’ হারুন সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে নামায আদায়ের জন্য প্রতি ওয়াকে ৩০ মিনিট করে বিরতি দেন। আয়ান হলেই তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে মসজিদে সালাত আদায় করেন। বাড়িতে অবস্থানকালে জনাব ‘খ’ নিয়মিত মসজিদে সালাত আদায় করেন।

ক) নাজাসাত কী?

খ) ‘জালাতের চাবি হল সালাত চাবি।’ ব্যাখ্যা করো।

গ) জনাব ‘ক’ কোন ধরনের ইবাদত পালন করেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) জনাব ‘খ’ -এর কার্যক্রমে সালাতের যে শিক্ষা ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ‘আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি?’ আয়াতটি ব্যাখ্যা করো।

২. নাজাসাত থেকে পরিত্র হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩. সালাতের ফরজ মানা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা করো।

৪. ‘সালাত দ্বীন ইসলামের খুঁটি স্বরূপ’ - উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

৫. সালাত কীভাবে মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে? বুঝিয়ে লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

কুরআন মজিদ হলো মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। আর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌলসম্মতিকে বলা হয় হাদিস। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফ হলো ইসলামের প্রধান দুটি উৎস। মহানবি (স.) বলেন, আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে (মেনে চললে) তোমরা কখনো পথভূষ্ট হবে না। এ দুটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত (মুসলিম)।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- আল-কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তাজবিদ-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ও মাখরাজ আয়ত করে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে সক্ষম হবো;
- কুরআনের নির্ধারিত পাঁচটি সূরা অর্থসহ মুখ্য বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নির্ধারিত পাঁচটি সূরার পটভূমি (শানে নুয়ুল) ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারব;
- হাদিসের পরিচয় ও গুরুত্ব এবং নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক দুটি হাদিসের অর্থসহ শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস অর্থসহ পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হাদিসের আলোকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

আল-কুরআনের পরিচয়

পরিচয়

কুরআন মজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি মহান আল্লাহর বাণী। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, তার গুণাবলি, ইমান ও ইসলামের সকল বিষয় এতে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানের সারকথা। কোন পথে চললে মানুষ সফলতা লাভ করবে তাও এতে বলে দেওয়া হয়েছে।

এটি মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। আজ পর্যন্ত এটি অবিকৃত রয়েছে। কেউ এর একটি নুকতা, অঙ্কর, শব্দ বা হৃরকতও পরিবর্তন করতে পারেনি। আর ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা, এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

কুরআন মজিদ অবতরণ

আল-কুরআন সর্বশেষ নবি ও রাসূল হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটি 'লাওহি মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.) আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার লোকজন ছিল মৃত্তিপূজক। তাদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি, কাটাকাটি ও কলহ-বিবাদ লেগেই থাকত। মহানবি (স.) এসব পছন্দ করতেন না। তিনি ভাবতেন যে, সকল মানুষের একজনই সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তাঁর দেখানো পথে চললে সমাজে কোনোরূপ অশান্তি থাকবে না। এজন্য তিনি হেরো গুহায় ধ্যানমঘ থাকতেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাঙ্গ হন। আল্লাহ তায়ালা ওহির ফেরেশতা হয়েরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর নিকট আল-কুরআন নাজিল করেন। এ সময় আল-কুরআনের সুরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুসারে কুরআনের নানা আয়াত নাজিল করা হয়। এভাবে মহানবি (স.)-এর ওপর দীর্ঘ ২৩ বছরে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নাজিল হয়।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা সর্বমোট ১০৪ (একশত চার) খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে ১০০ (একশত) খানা ছোট কিতাব। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর ৪ (চার) খানা বড়ো। এগুলো হলো- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল-কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। এরপর আর কোনো কিতাব আসবে না।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ গ্রন্থ। এতে দীনের যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের জীবনে যেসব সমস্যার উঙ্গিব হয়ে থাকে তার সমাধানের ব্যাপারে এতে নির্দেশনা রয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের মূল শিক্ষাও এতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল-কুরআন সর্বশেষ কিতাব।

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। এর ভাব ও ভাষা অনন্য ও অপূর্ব। এটি মহানবি (স.)-এর সবচেয়ে বড়ো মুজিয়া। কেউই এর স্ফুর্দ্রতম সুরার সমতুল্য কিছু রচনা করতেও সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

আল-কুরআনের গুরুত্ব

আল-কুরআন জ্ঞানসমূহের ভাগার। এতে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, তার গুণাবলির বর্ণনা, তার ক্ষমতা ও নিয়ামতসমূহের বর্ণনা। আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সৌরজগৎ, আসমান জমিন, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়, পর্বত সবকিছু সম্পর্কেই এতে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা, নবি-রাসূলগণের বিবরণ, পুণ্যবান ও পাপীদের অবস্থা ইত্যাদিও আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনে নানারকম বিধিবিধান ও আইনকানুন বর্ণিত হয়েছে। এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। কীভাবে চললে মানুষ দুনিয়া ও আধিরাতে শান্তি লাভ করবে এর দিকনির্দেশনাও আল-কুরআনে দেওয়া আছে। আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে দীনের সকল কিছুর জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে। আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং আমরা আল-কুরআন পড়ব এবং এর নানাবিধি জ্ঞান অর্জন করব।

পাঠ ২

কুরআন তিলাওয়াত (تِلَوَةُ الْقُرْآن)

পরিচয়

তিলাওয়াত আরবি শব্দ। এর অর্থ পাঠ করা, পড়া, আবৃত্তি করা। পবিত্র কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়।

আল-কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। সুতরাং একে আরবিতেই পড়তে হবে। এজন্য আরবি হরফ বা বর্ণসমূহ চিনে তিলাওয়াত করা শিখতে হবে। এভাবে আরবিতে সুন্দর করে স্পষ্ট উচ্চারণে আল-কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলে।

উল্লেখ্য, কুরআন শব্দটির মূল অর্থ পঠিত। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়েছে। সারা বিশ্বে আল-কুরআনই সবচেয়ে বেশি পাঠ (তিলাওয়াত) করা হয়। এজন্যই একে কুরআন বলা হয়। মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করেন। এছাড়া আমরা অন্য সময়েও কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক। এটি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এতে মানুষের কল্যাণের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন অধ্যয়ন করলে আমরা আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ জানতে পারব। বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম।

আমাদের প্রিয় নবি (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণ প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতেন। কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা সালাতে (নামাযে) কুরআন পড়তে হয়। আর কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সালাত শুন্দ হয় না। সুতরাং আমরা গুরুত্ব সহকারে শুন্দরপে কুরআন তিলাওয়াত শিখব এবং প্রতিদিন তিলাওয়াত করব।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত (মাহাত্য) অনেক বেশি। কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা হলো নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। যে ঘরে কুরআন পড়া হয় সে ঘরে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়। মহানবি (স.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফের পরিবর্তে দশটি করে নেকি লেখা হয়। সুতরাং বোঝা গেল যে, কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ কাজ। আমরা সবাই বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করব।

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন দেখে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। কুরআন মজিদ দেখে পড়াও উত্তম ইবাদত। কুরআন মজিদ দেখে দেখে অথবা মুখস্থ যেভাবেই পাঠ করা হোক তাতে পুণ্য রয়েছে। কুরআন পাঠ মনে প্রশান্তি আনে। অন্তরাত্মা পরিশুন্দ হয়। কিয়ামতের দিন কুরআন আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করবে যারা পার্থিব জীবনে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করত।

পাঠ ৩

তাজবিদ (الْتَّجْوِيدُ)

তাজবিদের পরিচয়

তাজবিদ শব্দের অর্থ উত্তম বা সুন্দর করা। আল-কুরআনের আয়াতসমূহকে উত্তমরূপে বা সুন্দর ও শুন্দ
করে পড়াকে তাজবিদ বলা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআনের প্রতিটি হরফকে মাখরাজ ও সিফাত অনুসারে
বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করাকে তাজবিদ বলে।

আরবি হরফ কোনোটি মোটা করে পড়তে হয়, আবার কোনোটি চিকন করে পড়তে হয়। উচ্চারণের
এ বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সিফাত। যেমন: ۳(তা) এবং ۶('ত') হরফ দুটির উচ্চারণের স্থান একই।
কিন্তু এদের সিফাত ভিন্ন। এ দুটো হরফের মধ্যে ۶(ত্ব্যা)-কে মোটা করে পড়তে হয় এবং ۳(তা)-কে
চিকন করে পড়তে হয়। আবার মাখরাজ হলো উচ্চারণের স্থান। যেমন: ۴(হা) এবং ۷(হা) এখানে হরফ
দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারণ করতে হয়। এভাবে মাখরাজ ও সিফাত ঠিক রেখে সুন্দর করে
কুরআন তিলাওয়াত করাই তাজবিদ।

তাজবিদের গুরুত্ব

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যিক। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গুনাহ হয়।
এতে অনেক সময় আল-কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অশুন্দ তিলাওয়াতের ফলে সালাতও
পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন: সূরা ইখলাসে এসেছে—**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكْلِمُ**— বলুন (হে নবি)! তিনি আল্লাহ; একক
ও অদ্বিতীয়। এখানে শব্দের অর্থ বলুন। আর যদি **ق** (ক্ষাফ)-কে ভুল মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করে
বলা হয় **ل** তাহলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। কেননা **ل** শব্দের অর্থ খাও বা ভক্ষণ কর। ফলে আল-কুরআনের
অর্থের বিকৃতি ঘটে। যা কোনোভাবেই জায়েজ নয়। তাজবিদ সহকারে শুন্দ ও সুন্দর করে কুরআন
তিলাওয়াতের গুরুত্ব উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَرَتِيلُ الْقُرْآنَ تَرْبِيلًا

অর্থ: কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে (সূরা আল-মুয়াম্বিল, আয়াত: ৪)।

তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আল্লাহ পাকের নির্দেশ। আর শুন্দরপে কুরআন শিক্ষার মাহাত্ম্য অনেক।
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয় (বুখারি)।

পাঠ ৪

মাখরাজ (الْمَخْرَج)

পরিচয়

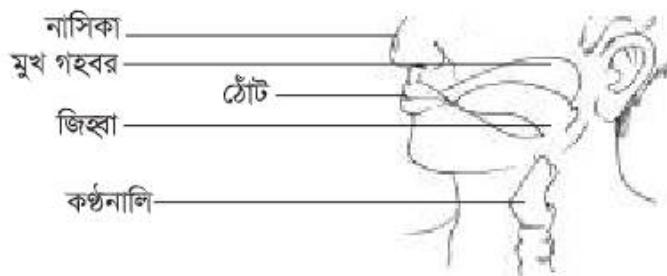
মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান, উচ্চারণের স্থান। আরবি হরফসমূহ মুখের যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় সে স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি হরফ (বর্ণ) মোট ২৯টি। এগুলো মুখের মোট ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এ ১৭টি স্থানকে বলা হয় মাখরাজ। মাখরাজ মোট ১৭টি।

১৭টি মাখরাজ আবার মুখের ৫টি স্থানে অবস্থিত। যথা— (১) মুখের খালি জায়গা বা জাওফ, (২) কঢ়নালি বা হলক, (৩) জিহ্বা, (৪) উভয় ঠোঁট এবং (৫) নাসিকামূল।

নিম্নে ছক আকারে কোন স্থানে কয়টি মাখরাজ অবস্থিত তা দেখানো হলো :

মুখের স্থান	মাখরাজ সংখ্যা
১. জাওফ বা মুখের খালি জায়গা	০১টি
২. হলক বা কঢ়নালি	০৩টি
৩. জিহ্বা	১০টি
৪. উভয় ঠোঁট	০২টি
৫. নাসিকামূল	০১টি



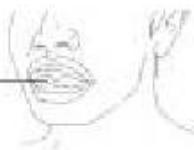
মাখরাজের বিস্তারিত বিবরণ

১। প্রথম মাখরাজ হলো জাওফ। জাওফ হলো মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এ স্থান থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথা—

ক. আলিফ (ا) যখন এর পূর্বের হরফে যবর থাকে। যেমন : ۴

খ. জয়ম বিশিষ্ট ওয়াও (و) যখন এর পূর্বের হরফে পেশ হয়। যেমন : ۵

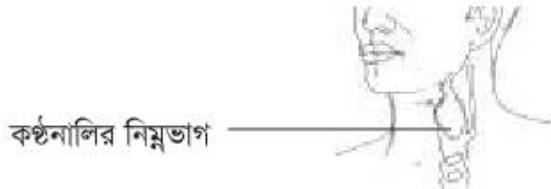
গ. জয়ম বিশিষ্ট ইয়া (ؑ) যখন এর পূর্বের হরফে ঘের হয়। যেমন : ۶



এ হরফ তিনটি মুখের খালি স্থান থেকে বাতাসের উপর উচ্চারিত হয়। এতে জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, কঢ়নালি কোনো কিছুরই ব্যবহার হয় না। এগুলোকে মান্দ-এর হরফ বলা হয়। অর্থাৎ এগুলো পড়ার সময় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

২। কঢ়নালির নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো—হাম্যা (ه) ও হা (ح)।

যেমন : ۷-۸



৩। কঢ়নালির মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো—হা (خ) ও আইন (غ)।

যেমন : ۹-۱۰



৪। কঠনালির উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো—খ (খ) ও গাইন (ঁ)।

যেমন : **খ** - **ঁ**



উপরিউভ ছয়টি হরফ কঠনালি বা হলক নামক স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ছয়টি হরফকে হরফে হলকি বা কঠবর্ণ বলা হয়।

৫। পঞ্চম মাখরাজ হলো জিহ্বার গোড়া এবং তার বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে একটি

হরফ উচ্চারিত হয়। এটি হলো—ক্ষাফ (ঁ)। যেমন : **ঁ**



৬। জিহ্বার গোড়ার সামান্য উপরের অংশ এবং এর বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে ক্ষাফ (ঁ) হরফটি উচ্চারিত হয়। যেমন : **ঁ**

জিহ্বার গোড়ার সামান্য উপরের অংশ এবং এর
বরাবর উপরের তালু



৭। জিহ্বার মধ্যভাগ এবং এর সোজা উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। এগুলো হলো— জিম (জ), শিন (শ), ইয়া (ই)। যেমন : আঁ-শ-ষ-ই-ই-

জিহ্বার মধ্যভাগ এবং এর সোজা
উপরের তালু



৮। অষ্টম মাখরাজ হলো জিহ্বার পার্শ্বভাগ ও উপরের পাটির দাঁতের মাড়ি। এ দুই-এর সংযোগে উচ্চারিত হয় দোয়াদ (ض) হরফটি।

জিহ্বার পার্শ্বভাগ ও উপরের
পাটির দাঁতের মাড়ি



এ হরফটি উচ্চারণে জিহ্বার পার্শ্বভাগকে ডান দিক অথবা বাম দিকের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লাগিয়ে উচ্চারণ করা যায়। যেমন : ض

৯। জিহ্বার অগ্রভাগের পাশ ও সামনের উপরের দাঁতের গোড়ার দিকের তালুর সাথে মিলে উচ্চারিত হয় একটি হরফ। এটি হলো— লাম (ل)। যেমন : ل

জিহ্বার অগ্রভাগের পাশ ও সামনের
উপরের দাঁতের গোড়ার দিকের তালু



১০। জিহ্বার অঞ্চলগ ও তার বরাবর উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় নূন (ঁ) হরফ।

যেমন : ফঁ

জিহ্বার অঞ্চলগ ও তার বরাবর
উপরের তালু



১১। জিহ্বার অঞ্চলগের পিঠ এবং সোজা উপরের তালু। এখান থেকে উচ্চারিত হয় রা (ৱ)। যেমন : রঁ

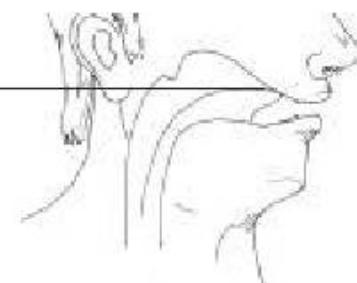
জিহ্বার অঞ্চলগের পিঠ এবং সোজা
উপরের তালু



১২। জিহ্বার অঞ্চলগ এবং সামনের উপরের দাঁতের গোড়া। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ।

এগুলো হলো— তা (ঁ), দাল (ঁ), ত্ব্যা (ঁ)। যেমন : ফঁ - ঢঁ - তঁ

জিহ্বার অঞ্চলগ এবং সামনের
উপরের দাঁতের গোড়া



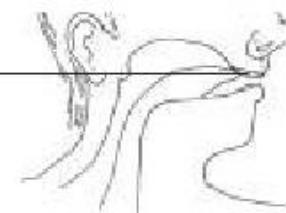
১৩। জিহ্বার অংগভাগ ও সামনের নিচের দুই দাঁতের মাথা এবং উপরের দাঁতের সামান্য অংশ মিলে উচ্চারিত হয় মোট তিনটি হরফ। এগুলো হলো— যা (ঝ), সিন (স), সোয়াদ (চ)।
যেমন : أَصْ - أَسْ - أَزْ

জিহ্বার অংগভাগ ও সামনের
নিচের দুই দাঁতের মাথা এবং
উপরের দাঁত



১৪। জিহ্বার অংগভাগ ও সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের মাথা। এখান থেকে উচ্চারিত হয় ছা (ঢ), যাল (ড), ঘোয়া (ঢ়)। যেমন : ফঁ - ঢঁ - ঢ়ঁ

জিহ্বার অংগভাগ ও সামনের
উপরের বড় দুই দাঁতের মাথা



উপরিউক্ত দশটি (৫ থেকে ১৪ নম্বর পর্যন্ত) মাখরাজ জিহ্বার সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৫। নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ বা ভিজা অংশ এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের মাথা। এ
মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় ফা (ফ)। যেমন : ফঁ

নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ বা
ভিজা অংশ এবং সামনের উপরের
দুই দাঁতের মাথা

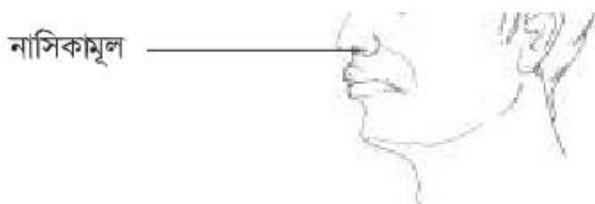


১৬। দুই ঠেঁট। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ। যথা—

- ক. বা (ବ) উচ্চারিত হয় নিচের ঠেঁটের ভিতরের অংশ থেকে। যেমন : بُ
- খ. মীম (ମ) উচ্চারিত হয় ঠেঁটের বাইরের বা শুক্র অংশ থেকে। যেমন : مُ
- গ. ওয়াও (و او) এ হরফ উচ্চারণে দুই ঠেঁট সরাসরি মিলিত হয় না। বরং উভয় ঠেঁট ডান ও বাম পাশ থেকে গোল হয়ে অর্ধফোটা ফুলের মতো মধ্যস্থলে ছিদ্র রেখে উচ্চারিত হয়। যেমন : وُ



১৭। শেষ মাখরাজ হলো নাসিকামূল। এখান থেকে গুরুহসমূহ উচ্চারিত হয়। যেমন : জয়মযুক্ত নুনকে কখনো কখনো গোপন করে নাসিকামূল থেকে উচ্চারণ করা হয়। তাশদিদযুক্ত নুনের মাখরাজও এটিই। যেমন : رُسْتَم - تُمِّ



তাজবিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো মাখরাজ। হরফ (বর্ণ)-সমূহকে নিজ নিজ মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকে উচ্চারণ করা আবশ্যিক। সুতরাং আমরা হরফগুলোর মাখরাজ শিখব ও নিয়মিত অনুশীলন করবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা —

- ক. আরবি ২৯টি বর্ণ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।
- খ. ১৭টি মাখরাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

নতুন শব্দ পরিচয়

- লাওহি মাহফুয় — সংরক্ষিত ফলক।
- হিদায়াত — দিকনির্দেশনা। সত্য দীনের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান।
- হরফ — বর্ণ।
- মুকতা — আরবি বর্ণসমূহের উপরে, নিচে বা মধ্যে ব্যবহৃত বিন্দু বা ফেঁটাকে মুকতা বলে।
- যেমন : ن - ب - ت
- হরকত — ঘবর, ঘের, পেশকে হরকত বলে।
- আয়াত — আল-কুরআনের এক একটি বাক্যকে বলা হয় আয়াত।
- জিবরাইল (আ.) — প্রধান ফেরেশতাগণের একজন। তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী নিয়ে নবি-রাসূলগণের নিকট আসতেন।
- মু'জিয়া — অলৌকিক ঘটনা বা বস্তু। নবি-রাসূলগণের দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা ও বস্তুকে মু'জিয়া বলা হয়।
- নাজিল — অবতীর্ণ।
- কালাম — বাণী।
- সাহাবা — হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথীগণ। যাঁরা মহানবি (স.)-কে ইমানসহ দেখেছেন এবং ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা হলেন সাহাবা।
- নফল — ঐচ্ছিক, ফরজের অতিরিক্ত।
- জায়েজ — বৈধ, অবৈধের বিপরীত।

অর্থ ও পটভূমিসহ আল-কুরআনের কতিপয় সূরা পাঠ ৫

সূরা আল-ফাতিহা (سُورَةُ الْفَاتِحَة)

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা হলো আল-ফাতিহা। ফাতিহা শব্দের অর্থ ভূমিকা, মুখবদ্ধ, দ্বার উন্মোচনকারী ইত্যাদি। যেহেতু এ সূরার মাধ্যমে কুরআনুল কারিম শুরু করা হয়, সেজন্য এ সূরার নাম আল-ফাতিহা। একে ফাতিহাতুল কিতাব বা ফাতিহাতুল কুরআনও বলা হয়। অর্থাৎ কিতাব বা কুরআনের ভূমিকা।

এ সূরাটি মাঝি সূরা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতের পূর্বে এ সূরাটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এ সূরাই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়ত সংখ্যা সর্বমোট ৭টি। সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এর বহু নাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. সূরাতুল হামদ (প্রশংসার সূরা) : এ সূরায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে।
২. উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী) : এ সূরা পবিত্র কুরআনের সারসংক্ষেপ।
৩. সূরাতুস সালাত (সালাতের সূরা) : সালাতের শুরুতে এ সূরা পাঠ করা অপরিহার্য। এ সূরা ব্যতীত সালাত শুরু হয় না।
৪. সূরাতুশ শিফা (রোগমুক্তির সূরা) : এ সূরার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
৫. সূরাতুদ্দ দোয়া (দোয়া বা প্রার্থনামূলক সূরা) : এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করা হয়।

শব্দার্থ

الْحَمْدُ	— সকল প্রশংসা।	نَعْبُدُ	— আমরা ইবাদত করি।
رَبٌّ	— রব, প্রতিপালক।	نَسْتَعِينُ	— আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।
الْغَلِيْقِينَ	— সমগ্র স্তুষ্টিগৎ, জগৎসমূহ।	إِهْرِيْنَا	— আমাদের পথ দেখাও।
مُلِيكٍ	— মালিক, অধিপতি।	صَرَاطٍ	— পথ, রাস্তা।
يَوْمِ الدِّيْنِ	— বিচার দিবস, কর্মকল দিবস।	أَنْعَمْتَ	— তুমি অনুগ্রহ করেছ।
إِيَّاكَ	— শুধু তোমরাই।	الْمَخْضُوبٍ	— ক্রোধ-নিপত্তি।
		الظَّالِمِينَ	— পথব্রষ্ট।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ০

১. সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই ।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু ।

مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ০

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক ।

إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ ০

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই ।

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ০

৫. আমাদের সরল পথ দেখাও ।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ০

৬. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ ।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ০

৭. তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপত্তি ও পথভ্রষ্ট ।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-ফাতিহা আল-কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা । এ সূরায় সম্পূর্ণ কুরআনের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে । এর প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে । শেষ তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার নিকট মানুষের মুনাজাত ও প্রার্থনার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে । আর মধ্যবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও দোয়া একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ।

আল্লাহ তায়ালা সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য । কেননা তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা । তিনিই বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক । সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তার রহমত ও করুণায় লালিতপালিত হয় । তার নিয়ামত সকলেই ভোগ করে । তাছাড়া তিনি শুধু ইহকালের মালিক নন, বরং তিনি পরকালেরও মালিক । কিয়ামত, হাশর, মিয়ান, জাহান-জাহান্নাম সবকিছুই তার অধীন । শেষ বিচারের দিনে তিনিই একমাত্র বিচারক । তিনিই নিজ ক্ষমতায় পুণ্যবানদের পুরক্ষার ও পাপীদের শাস্তি দেবেন । সুতরাং সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তারই প্রাপ্ত্য । এতে তার কোনো অংশীদার নেই ।

এই সূরার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন কুদরত ও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এবং মধ্যবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ শুধু তারই ইবাদত করবে এবং তারই নিকট সাহায্য চাইবে। কেননা তিনিই ইবাদতের যোগ্য। আর তিনি ব্যতীত সাহায্যকারী কেউ নেই।

এ সূরার শেষ তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালার নিকট মানুষের প্রার্থনা ও মুনাজাত বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহই সবকিছুর স্বষ্টি এবং নিয়ন্ত্রক। সুতরাং সঠিক পথ একমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন। তিনিই ভালো জানেন কোন পথ সঠিক আর কোন পথ ভাস্ত। অতএব, মানুষের উচিত তার নিকট সত্যপথের সন্ধান প্রার্থনা করা। যে পথ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ, নবি-রাসূলগণ অনুসরণ করেছেন সে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করা। আর যে পথে অভিশঙ্গ, পথভঙ্গের পরিচালিত হয়েছে সে পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা একক, অদ্বিতীয় ও সকল কিছুর মালিক। বিশ্বজগতের সকল প্রশংসনা তারই প্রাপ্য। তিনিই মানুষকে সরল, সঠিক পথের সন্ধান দেন। সুতরাং আমরা সকাল-সন্ধ্যায় তার প্রশংসনা করব। সবসময় তার ইবাদত করব। আর আমাদের সকল সঠিক পথের সন্ধান দানের জন্য তার নিকটই প্রার্থনা জানাব। সাথে সাথে পথভঙ্গ ও অন্যায়কারীদের আচরণ অনুসরণ থেকে আমরা বিরত থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পাশের বন্ধুকে সূরা ফাতিহা অর্থসহ শোনাবে।

পাঠ ৬

সূরা আন-নাস (سُورَةُ النَّاسِ)

আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরা আন-নাস। এটি পবিত্র কুরআনের ১১৪ তম সূরা। এ সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৬টি।

এ সূরায় **الْمُنْذَرُ** (আন-নাস) শব্দটি মোট পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরায় ব্যবহৃত এ **سُرْئَلْ** শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সূরা আল-ফাতিহায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসনা করা হয়েছে। তারপর তার নিকট সরল পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআনের অন্যান্য সূরায় মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখতে চায়। তাই সর্বশেষে এ সূরায় আল্লাহ পাকের নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। এভাবে কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে।

শব্দার্থ

قُلْ	— আপনি বলুন; তুমি বলো।	شَرِّ	— অনিষ্ট, ক্ষতি।
أَعُوذُ	— আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি শরণ নেই।	الْوَسْوَاسِ	— কুম্ভগাদাতা।
بِ	— রব, প্রতিপালক।	الْجَنَّابِ	— আত্মগোপনকারী (শয়তান)।
النَّاسِ	— মানুষ, মানবজাতি।	يُوسُفُ	— সে কুম্ভগা দেয়।
مَلِكٍ	— মালিক, অধিপতি।	صُدُورُ	— বক্ষসমূহ, অন্তরসমূহ।
إِلَهٍ	— মারুদ, উপাস্য।	الْجَنَّةُ	— জিন।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট।

مَلِكِ النَّاسِ ۝

২. মানুষের অধিপতির নিকট।

إِلَهِ النَّاسِ ۝

৩. মানুষের ইলাহ এর নিকট।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ هُوَ الْجَنَّابِ ۝

৪. আত্মগোপনকারী কুম্ভগাদাতা (শয়তান)-এর অনিষ্ট থেকে।

الَّذِي يُوسُفُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

৫. যে কুম্ভগা দেয় মানুষের অন্তরে।

مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

৬. জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা

সুরা আন-নাস-এর আয়াতসমূহে দুই প্রকারের আলোচনা রয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে মহান আল্লাহর তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো রব, মালিক ও ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই মানুষের রব, মালিক ও ইলাহ। তিনি ব্যতীত আর কেউ এ তিনটি গুণের অধিকারী নয়। মানুষ হলো তার বান্দা। সুতরাং মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। এভাবে সুরার প্রথম অংশে আল্লাহ তায়ালার তিনটি গুণের উল্লেখ করে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

সুরার দ্বিতীয় অংশে শয়তানের কুমক্রগা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশ্মন। সে গোপনে, প্রকাশ্যে, ঘুমন্ত অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় সবসময় মানুষকে কুমক্রগা দিয়ে থাকে। তার কাজই হলো কুমক্রগা দিয়ে মানুষের অন্তরকে বিপথগামী করা। মানুষ যেন আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়, তার ইবাদত না করে ইত্যাদি কুমক্রগা শয়তান দিয়ে থাকে। শয়তান শুধু জিনই নয় বরং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে। মানুষ শয়তানও অন্যকে প্রতারিত করে, দীন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এসব শয়তান থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় ব্যতীত বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য এ সুরায় শয়তানের সকল কুমক্রগা ও অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিপালক। তিনিই আমাদের মারুদ। আমাদের সকল কিছুই তার দান। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের প্রকৃত অধিপতি। সুতরাং তার আদেশ-নিষেধ আমরা সবসময় মেনে চলব। আর শয়তানের কুমক্রগা থেকে বেঁচে থাকব। কেননা শয়তান মানুষকে অন্যায়, অনৈতিক ও অশ্রীল কাজের দিকে পরিচালনা করে। ফলে শয়তানের কুমক্রগা থেকে বেঁচে থাকতে পারলে অনৈতিক কাজ থেকেও বেঁচে থাকা যাবে।

কাজ : শিক্ষার্থী পাশের বন্ধুকে সুরা আন-নাসের অর্থ ও নৈতিক শিক্ষা শোনাবে।

পাঠ ৭

সূরা আল-ফালাকু (سُورَةُ الْفَلَقِ)

সূরা আল-ফালাকু আল-কুরআনের ১১৩তম সূরা। এটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ হলো **الْفَلَقِ** (ফালাকু)। এ শব্দ থেকেই এ সূরার নাম সূরা আল-ফালাকু রাখা হয়েছে।

সূরা আল-ফালাকু ও সূরা আন-নাস-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ সূরা দুটিতে বিভিন্ন জিনিসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। এ সূরা দুটি নাজিলের কারণ নিম্নরূপ:

একবার লাবীদ ইবনুল আসাম নামক এক ইহুদি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওপর জাদু করে। এ কাজে সে তার কল্যাদের সাহায্য নেয়। তারা গোপনে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর একটি পবিত্র চুল সংগ্রহ করে এবং তাতে এগারোটি গিরা দিয়ে জাদু করে। ফলে রাসুল (স.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাদুর কারণে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কষ্ট হতে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা এ সূরা দুটি নাজিল করেন। এ সূরা দুটিতে মোট ১১টি আয়াত রয়েছে। প্রতিটি আয়াত পড়ে প্রতিটি গিরাতে ফুঁক দিলে জাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

শব্দার্থ

الْفَلَقِ	— প্রভাত, উষা।	وَقَبَ	— গভীর হলো, আচ্ছন্ন হলো।
وَنِ	— হতে, থেকে।	النَّفَثَةٌ	— ফুঁক দানকারী নারীগণ।
خَلَقَ	— তিনি সৃষ্টি করেছেন।	الْعَقِبِ	— গ্রহিসমূহ, গিরাসমূহ।
غَاسِقٍ	— রাতের অঙ্ককার।	حَاسِبٍ	— হিংসাকারী, হিংসুক।
إِذَا	— যখন।	حَسَدٍ	— সে হিংসা করল।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রভাতের স্রষ্টার নিকট।

وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○

৩. রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়।

وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○

৪. এবং অনিষ্ট থেকে ঐ সমস্ত নারীদের, যারা গ্রহিতে ফুর্তকার দেয়।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ إِذَا حَسَدَ ○

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার নিকট অনিষ্টকর বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর প্রথম আয়াতে উষার রব আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। মূলত আল্লাহ পাক সকল শক্তির উৎস। বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে রূপান্তর করেন। তিনিই সকাল, সন্ধ্যা, উষা ইত্যাদির আগমন ঘটান। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে তিনিই রক্ষা করেন। এজন্য সূরার প্রথমেই আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সবকিছুরই স্রষ্টা। এসব সৃষ্টির মধ্যে অনেক হিংসা, বিষাক্ত ও অনিষ্টকর সৃষ্টি ও রয়েছে। এগুলো মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলোর অনিষ্ট থেকে রক্ষাকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। গভীর রাতে নানারূপ বিপদাপদ ঘটতে পারে। যেমন: জিন, শয়তান, চোর, ডাকাত, শক্র আক্রমণ ইত্যাদি। এসবের অনিষ্ট থেকেও রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহ। তাছাড়া জাদুকর নরনারী ও হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয়দাতাও আল্লাহ তায়ালা। আয়াতগুলোতে উল্লিখিত সমূদয় বিষয় থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

নেতৃত্ব শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রভু। তিনিই সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। সুতরাং সকল বিপদে-আপনে আমরা তাঁরই নিকট সাহায্য চাইব। সব ধরনের অনিষ্ট থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব। সাথে সাথে হিংসা, জাদু-টোনা, অপরের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি কাজ থেকে আমরা নিজেরা বিরত থাকব।

পাঠ ৮

সূরা আল-হুমায়াহ (سُورَةُ الْهُمَزَةِ)

সূরা আল-হুমায়াহ আল-কুরআনের ১০৪ তম সূরা। এ সূরাটি পবিত্র মুকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ৯টি। এ সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হুমায়াহ অনুসারে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখ্য করব এবং এ সূরার শিক্ষা অনুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

وَيْلٌ	— দুর্ভোগ, ধৰ্মস।	لَّا	— কখনো নয়।
فَ	— প্রত্যেক, সকল।	لَيْبَدَنْ	— অবশ্যই সে নিষ্কিঞ্চ হবে।
هُمَزَةٌ	— পশ্চাতে নিন্দাকারী।	الْحَمْزَةُ	— হৃতামাহ, একটি জাহানামের নাম।
لَمَزَةٌ	— সম্মুখে নিন্দাকারী।	مَا أَذْرَكَ	— আপনি কি জানেন?
جَعْ	— সে জমা বা একত্র করেছে, সে সঞ্চয় করেছে।	نَارٌ	— আগুন।
مَالٌ	— মাল, ধনসম্পদ।	تَطْلِعُ	— তা গ্রাস করবে।
عَلَّذَةٌ	— সে বারবার গণনা করেছে।	أَلْفِيلَةٌ	— দুদয়সমূহ, অন্তরসমূহ।
يَخْسَبُ	— সে ধারণা করে, সে হিসাব করে।	مُؤْصَلَةٌ	— পরিবেষ্টিত।
أَخْلَدَةٌ	— তা অমর করেছে, তা চিরস্থায়ী করেছে।	عَمِّ	— স্তুতিসমূহ, খুচিসমূহ।
		مُجَلَّدةٌ	— দীর্ঘায়িত, প্রলম্বিত।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَرٍ لِّمَرَةٍ ○

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدًا ○

২. যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে।

يَجْسُبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ ○

৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

كَلَّا لِمَنْ يُنْبَدِئُ فِي الْحَكْمَةِ ○

৪. কখনো না; সে অবশ্যই হতামায় নিষ্ক্রিয় হবে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَكْمَةُ ○

৫. আর আপনি কি জানেন, হতামাহ কী?

قَارُونَ الَّذِي الْمُوْقَدَةُ ○

৬. এটি আল্লাহর প্রজ্ঞালিত আগুন।

الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ○

৭. যা অস্তরসমূহ ধ্বাস করবে।

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○

৮. নিশ্চয়ই এটি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে।

فِي عَمَلٍ مُّعَذَّبَةٍ ○

৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

শানে নৃযুল

উমাইয়া ইবনু খালফ, ওলীদ ইবনু মুগিরা ও আখনাস ইবনু শুরায়ক মহানবি (স.) ও মুমিনদের গিবত করত এবং তাদের অর্থলিঙ্গা ছিল প্রবল। তাদের এই অপকর্মের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন মহান আল্লাহ এই সুরা অবতীর্ণ করেন।

ব্যাখ্যা

সুরা আল-হমায়াহকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম তিন আয়াত নিয়ে প্রথম অংশ এবং শেষ ছয়টি আয়াত নিয়ে দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি জব্বন্য গুনাহের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে এসব গুনাহের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এ সূরায় বর্ণিত গুনাহ বা পাপ কাজগুলো হলো—

ক. পশ্চাতে বা গোপনে কারো নিন্দা করা। একে গিবতও বলা হয়। এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের অন্য আয়াতে গিবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন।

খ. সামনাসামনি কারো নিন্দা করা। গোপনে নিন্দা করার মতো এটাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর ফলে মানুষ অপমানিত হয়। অনেক সময় মানুষের মধ্যে ঝগড়াফ্যাসাদ ও মারামারির সৃষ্টি হয়।

গ. ধনসম্পদ জমা করা ও বারবার তা গণনা করা। একে এক কথায় অর্থলিঙ্গ বা আয়ের লোভ বলা যায়। ধনসম্পদের প্রতি লোভী হলে মানুষ নানা অবৈধ পথে উপার্জন করতে থাকে। সে ক্রপণ হয়ে পড়ে। গরিব-দুঃখীদের অধিকার আদায় করে না। যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরজ ইবাদতও পালন করে না। বরং সে সম্পদ জমা করতে থাকে এবং ধারণা করে যে, এসব ধনসম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত তিনটি জঘন্য কাজের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গিবত, পরনিন্দা ও অর্থলিঙ্গ তিনটিই খারাপ কাজ। এগুলো কবিরা গুনাহ। এজন্য আখিরাতে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থ মানুষকে অমর করে রাখবে এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং সকল মানুষকেই মরতে হবে। তারপর হাশেরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের হিসাব নেবেন। যারা দুনিয়াতে এ তিনটি জঘন্য কাজ করে আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের স্থান হবে হৃতামাহ নামক জাহান্নামে। হৃতামাহ আগনে ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুলবে। এমনকি তাদের হৃদয় বা অন্তরও ঐ আগনে পুড়বে। কোনো কিছুই আগনের হাস থেকে রেহাই পাবে না।

নৈতিক শিক্ষা

সূরা আল-হুমায়াহ-এর নৈতিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তিনটি মারাত্মক গুনাহের বা পাপ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো গিবত তথা পশ্চাতে বা গোপনে কারো নিন্দা করা, সামনাসামনি নিন্দা করা ও অর্থলিঙ্গ। এ তিনটিই নীতিহান কাজ, অনৈতিক কাজ। উক্ত চরিত্রবান লোক এসব কাজ করতে পারে না। বরং নীতিবান হতে হলে এসব দোষ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অতএব, আমরাও এসব দোষ থেকে বেঁচে থাকব। কখনো কারো নিন্দা করব না। আর অর্থের প্রতি লোভ করব না। বরং আল্লাহ তায়ালা যে ধনসম্পদ দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকব এবং প্রয়োজনমতো তা খরচ করব।

পাঠ ৯

সূরা আল-আসর (سُورَةُ الْعَصْرِ)

সূরা আল-আসর আল-কুরআনের ১০৩তম সূরা। এটি মুক্ত শরিফে অবরুদ্ধ। এর আয়াত সংখ্যা মাত্র তিনি। এ সূরার প্রথমে আল্লাহ তায়ালা আসর বা মহাকালের শপথ করেছেন। এজন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-আসর। পবিত্র কুরআনের ছেট সূরাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এ সূরার তাৎপর্য অত্যন্ত

ব্যাপক। ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেছেন, 'যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি নিয়ে চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল' (ইবনে কাসির)। অর্থাৎ এ সূরার অর্থ ও তাংপর্য বুঝতে পারলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের পথ লাভ করত। সুতরাং আমরা এ সূরাটি অর্থসহ শিখব। অতঃপর এর তাংপর্য শিক্ষা করব এবং তদানুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

وَ	- শপথ, কসম।	الَّذِينَ	- যারা।
الْعَضْرِ	- সময়, যুগ, কাল, মহাকাল।	أَمْنُوا	- তারা ইমান এনেছে।
إِنَّ	- নিশ্চয়ই, অবশ্যই।	وَعَمِلُوا	- তারা আমল করেছে।
الْإِنْسَانَ	- মানুষ।	الصِّلْحَتِ	- সৎকর্মসমূহ।
خُسْرٍ	- ক্ষতি।	وَتَوَاصَوْا	- তারা পরম্পরকে উপদেশ দিয়েছে।
إِلَّا	- ব্যতীত, ছাড়া।	الْحَقِّ	- সত্য।
		الصَّابْرُ	- ধৈর্য।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعَضْرِ ○

১. মহাকালের শপথ।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ○

২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিথন্ত।

إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ هُوَ تَوَاصُوا بِالصَّابْرِ ○

৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরম্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

শানে নুযুল

ওলীদ ইবনু মুগিরা, আস ইবনু ওয়াইল, আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব প্রমুখ মুশরিক বলত যে, মুহাম্মদ (স.) অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে (তাদের কথার অসারতা প্রমাণ করে) আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি নাজিল করেন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-আসরের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা সময় বা মহাকালের শপথ করেছেন। মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ সময়ের মধ্যেই মানুষকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সময়ের সম্বৰহার করতে হবে। যারা দুনিয়াতে সময়ের সম্বৰহার করবে এবং নেক আমল করবে পরকালে তারাই সফলতা লাভ করবে। তাই সময়ের শপথ করে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা সময়ের সম্বৰহার করে না, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না। যারা একৃপ মনগড়ভাবে জীবনযাপন করবে তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তৃতীয় ও শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চারটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে যারা এ চারটি কাজ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং তারা সফলতা লাভ করবে। আর যারা দুনিয়াতে এ কাজগুলো করবে না তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কাজগুলো হলো ইমান আনা, সংকর্ম করা, সত্ত্বের উপদেশ দেওয়া ও ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া।

এ কাজগুলোর প্রথম দুটি কাজ ব্যক্তিগত। অর্থাৎ প্রথমে ইমান আনতে হবে। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় কাজ হলো ভালো কাজ করা। আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে। আর তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার নামই নেক কাজ।

চারটি কাজের মধ্যে শেষের কাজ দুটি সামাজিক। অর্থাৎ একা একা এ কাজ দুটি করা যাবে না। এর প্রথমটি হলো-সমাজের মানুষকে সত্ত্বের উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষকে সত্যপথের দিকে ডাকা। তাদের নেক কাজে উৎসাহিত করা, অন্যায় কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা ইত্যাদি। সামাজিক দায়িত্বের শেষটি হলো মানুষকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া। বিপদ-আপদ, দুঃখকষ্ট আল্লাহ তায়ালারই দান। এগুলোর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে হতাশ ও নিরাশ হওয়া যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে পরম্পরাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

নেতৃত্ব শিক্ষা

আমরা সবাই সফলতা লাভ করতে চাই। কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাই না। সুতরাং আমরা ইমান আনব এবং নেক কাজ করব। কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অনেতৃত্ব কাজ করব না। সাথে সাথে আমরা আমাদের বন্ধুবন্ধব, ভাইবেন, আত্মীয়সজ্ঞ, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহবান করব। সবাইকে উন্নত চরিত্বাবান ও নৈতিক হতে উৎসাহ দেবো। বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করব। হতাশ হয়ে কখনো অন্যায় ও অনেতৃত্ব কাজ করব না।

কাজ : ক্লাসের সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল সুরা আল-আসর অর্থসহ মুখস্থ বলবে। অন্যদল এ সুরার ব্যাখ্যা ও নেতৃত্ব শিক্ষা সম্পর্কে বলবে। একইভাবে দ্বিতীয় দল প্রথম কাজটি এবং প্রথম দল পরের কাজটি করবে।

পাঠ ১০

অর্থসহ মুনাজাত বিষয়ক তিনটি আয়াত

পৃথিবীতে চলার জন্য আমাদের নানা জিনিসের প্রয়োজন। এসব জিনিস পাওয়ার জন্য আমরা বহু কষ্ট করি। আল্লাহ তায়ালার দয়া ব্যুত্তি কোনো কিছুই আমরা লাভ করতে পারি না। মহান আল্লাহ আমাদের রব। তিনিই সবকিছু আমাদের দান করেন। দুনিয়া-আধিরাতের সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তায়ালারই দান। সুতরাং কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকটই প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনাকেই মুনাজাত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আমাদের মুনাজাত করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। আল-কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো। আমরা এসব আয়াত শিখব ও অর্থ জানব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব।

আয়াত ১

رَبَّنَا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে এবং আধিরাতে কল্যাণ দাও। আর আমাদের আগন্তের শান্তি থেকে রক্ষা কর (সুরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০১)।

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। এরপর রয়েছে আধিরাত। আধিরাত হলো চিরস্থায়ী। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এ দুটি জীবনে কল্যাণ লাভ করাই হলো প্রকৃত সফলতা। দুনিয়ার জীবনে আমরা সুখ-শান্তি চাই। আর আধিরাতে চাই মুক্তি ও সফলতা। পরকালে জাহানামের শান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া হলো সবচেয়ে বড় সফলতা। আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে এ সমস্ত কল্যাণ ও সফলতা। আল্লাহ তায়ালা এগুলো মানুষকে দান করেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাব। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন। দুনিয়া ও আধিরাতের সমস্ত কল্যাণ লাভের জন্য এ দোয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াত ২

رَبِّ ارْجُمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا نَصْغِيرًا ○

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালনপালন করেছেন (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৪)।

মাতাপিতা সন্তানের অতি আপনজন। তাঁরা অত্যন্ত আদর-দ্রেছে সন্তানকে লালনপালন করেন। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান। নিজেরা কষ্ট করে সন্তানকে আরাম-আয়েশে রাখেন। বিশেষ করে শৈশবকালে তাঁরা আমাদের খুব যত্নের সাথে প্রতিপালন করেন। শিশুকালে সকল মানুষই অসহায় থাকে। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না, খেতে পারে না, চলাফেরা করতে পারে না। এমনকি কথাবার্তাও বলতে পারে না। মাতাপিতাই এ সময় মানুষের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। তাঁরাই এ সময় সন্তানকে মায়া-মমতা দিয়ে বড় করে তোলেন। অতএব, আমাদের সকলের কর্তব্য মাতাপিতার আনুগত্য করা। তাঁদের কথা মেনে চলা। তাঁদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করা। এ আয়াতে মহান আল্লাহ মাতাপিতার জন্য দোয়া করার বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এ আয়াত অর্থসহ শিখব। অতঃপর আন্তরিকভাবে এ আয়াত পড়ে মহান আল্লাহর নিকট আমাদের মাতাপিতার জন্য দোয়া করব। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের কল্যাণ ও রহমত দান করবেন।

আয়াত ৩

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর (সূরা তৃ-হা, আয়াত : ১১৪)।

উক্ত আয়াতে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মুনাজাত করার কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। কেননা শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারি। তার বিধান ও বাণী জানতে পারি। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আমরা মানুষের মতো মানুষ হই। জীবনে উন্নতি লাভের জন্যও জ্ঞানার্জন করা জরুরি। সুতরাং আমরা ভালো করে লেখাপড়া শিখব। জ্ঞানার্জনে কোনোরূপ অবহেলা করব না। আর সাথে সাথে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট মুনাজাত করব। কেননা মহান আল্লাহই সবকিছুর মালিক। তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করেন। অতএব, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাঁর নিকটই প্রার্থনা করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে দুই হাত তুলে মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

পাঠ ১১

আল-হাদিস (أَحْيِيْث)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবি (স.) যা কিছু বলতেন তা-ই হাদিস।

তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন তাও হাদিস। আর যে সমস্ত কাজ সাহাবিগণ তাঁর সামনে করেছেন কিন্তু তিনি তাঁদের নিয়ে করেননি বরং ঐ সমস্ত কাজে মৌনসম্মতি দিয়েছেন এগুলোও হাদিস। হাদিসের অপর নাম হলো সুন্নাহ।

সাহাবিগণ রাসূল (স.)-এর সবরকম হাদিসই সংরক্ষণ করতেন। রাসূল (স.) কিছু বললে সাথে সাথে তাঁরা তা মুখ্য করতেন। নবি করিম (স.) যে কাজ যেভাবে করতেন সাহাবিগণও তা ঠিক তেমনিভাবে আদায় করতেন। অতঃপর নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধুবাঙ্গবগণের নিকট এগুলো পৌছে দিতেন। এভাবে মহানবি (স.)-এর জীবদ্ধশায় হাদিস সংরক্ষণ করা হয়। নবি করিম (স.)-এর ইস্তিকালের পর সাহাবিগণ মজলিস করে হাদিস শিক্ষা দিতেন। দূরদূরাত্ম থেকে লোকজন তাঁদের নিকট হাদিস শিখতে আসতেন। পরবর্তীকালে মুহাম্মদসগণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সকল হাদিস লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তাঁরা হাদিসের বছ কিতাব সংকলন করেন। এভাবে আমরাও নবি কারিম (স.)-এর হাদিস লাভ করি।

হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামে হাদিসের স্থান অত্যন্ত উৎকর্ষ। ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হলো হাদিস। আর এর প্রথম উৎস হলো আল-কুরআন। সুতরাং ইসলামে আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানা নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর নবি করিম (স.) হাদিসের মাধ্যমে তা মানুষের নিকট বিশ্লেষণ করেছেন। নিচের উদাহরণটি পড়লে আমরা স্পষ্টভাবে বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন : আল-কুরআনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে আমরা সালাত আদায় করব তা বলে দেওয়া হয়নি। একাকী পড়ব না-কি সকলে মিলে পড়ব, কত রাকআত পড়ব, কোন সময় পড়ব, রূক্তি-সিজদাহ কীভাবে করব ইত্যাদি কিছুই কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এগুলো আমরা হাদিসের মাধ্যমে পাই। রাসূলুল্লাহ (স.) এসব নিয়মকানুন আমাদের বলে দিয়েছেন। তিনি নিজে সালাত আদায় করে আমাদের হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদিস না থাকলে আমরা তা কখনোই জানতে পারতাম না। সুতরাং কুরআনের পরই হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল। তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ। তাঁর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করি। তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই আমাদের সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতেন। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তাঁর এসব আদেশ-নিয়ে হলো হাদিস।

পবিত্র হাদিস আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেছেন, “রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিয়ে করেন তা থেকে বিরত থাকো” (সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭)।

অতএব রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদিস আমরা পাঠ করব। তার অর্থ বুঝব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। তাঁর আদেশগুলো মেনে চলব এবং নিয়ে গুলো থেকে বিরত থাকব।

পাঠ ১২

অর্থসহ নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক দুটি হাদিস

নীতি ও নৈতিকতা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। নীতি হলো কথায় ও কাজে সৎ, সুন্দর ও মার্জিত হওয়া। কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজকর্ম না করা। নীতিহীন মানুষ পশ্চর সমান। যে ব্যক্তি চলাফেরা ও কথাবার্তায় নীতির অনুসরণ করে না, সমাজের সকলে তাকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে নীতিবান মানুষকে সবাই ভালোবাসে। সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বোচ্চ নীতির অধিকারী। তিনি সর্বদা নীতি ও আদর্শের অনুশীলন করতেন। উভয় চরিত্র ও নীতির জন্য শক্রঝাও তাঁর অশংসা করত।

হাদিসসমূহে আমরা দেখতে পাই মহানবি (স.) উম্মতগণকেও নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে দুটি নীতিমূলক হাদিস উল্লেখ করা হলো। আমরা এগুলো মুখস্থ করব, এর অর্থ জানব। আমরা এ নীতিমূলক হাদিস অনুযায়ী আমল করব।

হাদিস ১

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

অর্থ: যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন করে না তার কোনো দীন নেই অর্থাৎ সে প্রকৃত দীনদার নয় (শুয়াবুল ইমান)।

শিক্ষা

অঙ্গীকার পালন করা নীতি-নৈতিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা নানা সময় নানারূপ ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে থাকি। এসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। পরম্পর মারামারি ও অশান্তি ঘটে। সুতরাং সামাজিক শান্তির জন্য অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যিক। ইসলামে অঙ্গীকার রক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবি (স.) নিজে সর্বদা অঙ্গীকার রক্ষা করে চলতেন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা প্রকৃত দীনদার ব্যক্তির লক্ষণ নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ দীনদার সে সবসময় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে। সে কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। অতএব, আমরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না। বরং জীবনের সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা প্রকৃত দীনদার হতে পারব।

হাদিস ২

وَإِنَّمَا كُفْرُهُ وَالْكَذِبُ فِيَّ أَنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجْوَرِ وَإِنَّ الْفَجْوَرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ (بخاري و مسلم)

অর্থ: তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহানাম পর্যন্ত পৌছে দেয় (বুখারি ও মুসলিম)।

শিক্ষা

মিথ্যা হলো সত্যের বিপরীত। প্রকৃত কথা, কাজ, বিষয়, অবস্থা ইত্যাদি গোপন করাকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ তাকে ভালোবাসে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ সাহায্য-সহযোগিতাও করে না। মহানবি (স.) ছিলেন চরম সত্যবাদী। তিনি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি

মানুষকে সত্য কথা বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানুষকে মিথ্যা ত্যাগ করতে বলেছেন। কেননা মিথ্যা হলো সকল পাপের মূল। মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। কোনো পাপ কাজ করে মিথ্যা বললে অনেক সময় তা ধরা যায় না। ফলে মানুষ পুনরায় পাপ করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন ও জানেন। তার নিকট মিথ্যা বলা যায় না। বরং দুনিয়ার সব পাপের তিনি হিসাব রাখেন। হাশেরের ময়দানে তিনি এসবের বিচার করবেন।

যেহেতু মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপের শাস্তি হলো জাহানাম। সুতরাং আমরা মিথ্যা বলা পরিহার করব। সর্বদা সত্য কথা বলব। তাহলে জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল নেতৃত্বক গুণাবলি বিষয়ক হাদিস দুটি অর্থসহ মুখ্য বলবে। অন্যদল হাদিস দুটির শিক্ষা সম্পর্কে বলবে। আবার প্রথম দল উক্ত হাদিসের শিক্ষা এবং দ্বিতীয় দল হাদিস দুটি অর্থসহ মুখ্য বলবে।

পাঠ ১৩

অর্থসহ মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস

মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক। তিনি মানুষকে সবধরনের কল্যাণের পথে পরিচালনা করতেন। মানুষ কীভাবে চললে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করবে তাও তিনি দেখিয়ে গেছেন। উচ্চতের কল্যাণের জন্য তিনি বহু মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। এসব মুনাজাত হাদিস শরিফে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিম্নে মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস উল্লেখ করা হলো। আমরা এ হাদিস দুটি অর্থসহ মুখ্য করব এবং এগুলোর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট মুনাজাত করব।

হাদিস ১

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَأِي وَعَمَدِي (طরানি)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ, ভুলগুচ্ছগুলো এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও (তাৰানি)।

আমরা কথাবার্তা, চলাফেরায় নানারূপ পাপ কাজ করে ফেলি। ছেটো-বড়ো, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত এসব পাপ আখিরাতে আমাদের শাস্তির কারণ হবে। অতএব, এগুলো থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাওয়া দরকার। কেননা মহান আল্লাহই একমাত্র ক্ষমা করার মালিক। সুতরাং আমরা সবসময় এ হাদিসের মাধ্যমে ভুলগুচ্ছ ও পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব।

হাদিস ২

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلِيًّا تَفْعَالُ وَرِزْقًا طَيِّبًا (ابن ماجة)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা এবং পবিত্র (হালাল) রিজিক চাই (ইবন মাজাহ)।

খাদ্য ও জ্ঞান মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর উপকারী বিদ্যা অর্জন করাও জরুরি। এ উভয় জিনিসের জন্যই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। এ হাদিসের মাধ্যমে প্রিয় নবি (স.) আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকট এ দৃষ্টি জিনিসের জন্যই প্রার্থনা করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এ দোয়াটি মুখস্থ করব ও এর মাধ্যমে মুনাজাত করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা উভয় হাত তুলে নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে এবং প্রার্থনায়
পাঠের হাদিস ২টি অর্থসহ বলবে।

পাঠ ১৪

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হাদিস

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ও নীতি-আদর্শের শিক্ষাকে ধরে রাখার চেষ্টা ও চেতনাই হলো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য এ মূল্যবোধের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ মানুষকে উন্নত চরিত্রবান করে গড়ে তোলে। ফলে মানুষ সমাজে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। সকলে এ আদর্শ অনুশীলন করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে সমাজে শান্তি থাকে না। দুনীতি, সন্ত্রাস, চুরি, ডাক্তাতি, ছিনতাই, প্রতারণা ইত্যাদি ছাড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, ঐক্য, ভালোবাসা ইত্যাদি সদ্গুণাবলির চর্চা থাকে না। মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে। ফলে সমাজে নানা অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মহানবি (স.)-এর হাদিস নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা পূর্বপাঠে হাদিসের পরিচয় লাভ করেছি। হাদিসের মাধ্যমে আমরা প্রিয় নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি মানুষের সাথে কীরুপ আচরণ করতেন তা জানতে পারি। তাঁর উন্নত চরিত্রের কথা জানতে পারি। তিনি আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন তাও আমরা হাদিস পড়ে জানতে পারি।

হাদিস শরিফে প্রিয় নবি (স.) আমাদের নানাবিধ নৈতিক ও মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দয়া, ক্ষমা, সাম্য, মৈত্রী, আত্মত্ব, ভালোবাসা, পরম্পর সহযোগিতা ইত্যাদি গুণ অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আবার মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চুরি-ডাকাতি করা, গালিগালাজ করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ইত্যাদি খারাপ কাজ করতে আমাদের নিয়েথ করেছেন। হিংসা-বিদ্রোহ, গর্ব-অহংকার, খোশামোদ-তোষামোদ ইত্যাদিও খারাপ অভ্যাস। এগুলো মানবিক আদর্শের বিপরীত। এগুলো নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। এগুলো থেকেও বিরত থাকার জন্য মহানবি (স.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

إِنَّمَا الْحُسْنَىٰ فِي إِكْفَانِ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (أَبُو دَاوُد)

অর্থ : তোমরা হিংসা থেকে বিরত থাকবে। কেননা আগুন যেমন কাঠকে পুড়িয়ে দেয় হিংসাও তেমনি নেক আমলসমূহকে ধ্বংস করে দেয় (আবু দাউদ)।

সংগৃগাবলির অনুশীলন ও অসৎ গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমরা উত্তম চরিত্রবান হতে পারি। এগুলো আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায়ও সাহায্য করে। এভাবে হাদিসের শিক্ষা আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

হাদিস শরিফে মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত ও উত্তম চরিত্রের আদর্শ বর্ণিত আছে। আমাদের প্রিয় নবি (স.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলেছেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ○

অর্থ : আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী (সূরা আল-কালাম, আয়াত : ৮)।

মহানবি (স.) ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি সবসময় নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করতেন। তাঁর একটি উপাধি ছিল আল-আমিন। আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী, বিশ্বাস, সত্যবাদী। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন। কথা ও কাজে সতত অবলম্বন করতেন। কেউ কোনো কিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তিনি তা মালিকের নিকট ঘথাযথভাবে ফেরত দিতেন। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। ফলে তাঁর শক্ররাও তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী নামে ডাকত।

এভাবে দেখা যায়, সবধরনের সংগৃণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, দয়াবান, অতিথিপরায়ণ, মিষ্টভাষী। তিনি অন্যায় ও অশ্রীল কাজ কখনো করতেন না। অশালীন চলাফেরা ও কথাবার্তা তাঁর থেকে কখনো প্রকাশিত হয়নি। সারাজীবন তিনি মানুষকে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলের (স.) এ আদর্শ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রিয় নবি (স.)-এর চরিত্র অনুসরণ করলে কখনোই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ লজ্জিত হবে না। বরং এর দ্বারা আমরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব। আমাদের মধ্য থেকে দুর্নীতি ও পশত্র দূরীভূত হবে। রাসূলের (স.) জীবনাদর্শ হাদিস শরিফে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ। আমরা হাদিস পড়ে এগুলো জানব এবং সে অনুযায়ী আমল করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন সূরাটি আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা?

- ক) সূরা আল-ফালাক
- খ) সূরা-আন নাস
- গ) সূরা আল-হুমায়াহ
- ঘ) সূরা আল-আসর

২. সূরা আল-ফাতহার নৈতিক শিক্ষা হলো-

- i) আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির মালিক
- ii) ইবাদাত কেবল আল্লাহ তায়ালার জন্য করা
- iii) অন্যায়কারীদের আচরণ অনুসরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উজ্জীপক্তি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাবিহা ও মালিহা দুই বাকবী, সাবিহা মাগরিবের সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে গিয়ে ২ ও ৩ এর উচ্চারণ সঠিকভাবে করেনি। অপরদিকে মালিহা প্রতিদিন সকালে সুলিলিত কঢ়ে কুরআনের সূরা নাস, ফালাক ও হুমায়াহ তিলাওয়াত করে। তিলাওয়াত নিয়মানুযায়ী হওয়ায় তার মাদ্রাসা শিক্ষক বাবা খুশি হয়ে তাকে একটি কলম উপহার দেন।

৩. সাবিহা তিলাওয়াতে কোন বিধানটি অনুসরণ করেনি?

- ক) তাজবীদ
- খ) সিফাত
- গ) নাযিরা তিলাওয়াত
- ঘ) মাখরাজ

৪. মালিহার তিলাওয়াতে কোরআন শিক্ষার যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তার ফলে -

- i. সালাত সঠিকভাবে আদায় হবে
- ii. আল্লাহর আদেশ পালিত হবে
- iii. সামাজিক নিয়ম অনুসৃত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১)

দৃশ্যপট-১

জনাব ‘ক’ একজন মুমিন ব্যক্তি। তিনি নিজেকে সর্বদা ভাল কাজে নিয়োজিত রাখেন। কেউ বিপদে পড়লে তিনি তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় সবার আগে এগিয়ে আসেন।

দৃশ্যপট -২

কালাম সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার অফিসের ম্যানেজার সাহেবকে পূর্ণ একবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে বললেন, ম্যানেজার সাহেব হিসেবে ভুল করলে তাকে ক্ষমা করে পুনরায় সঠিকভাবে হিসেব উপস্থাপন করতে বলেন। তিনি তার দরিদ্র আতীয় স্বজনদের ঘর করে দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবনং এলাকার অভাবী মানুষদেরকে দান সদকা করেন।

ক) হাদিস কাকে বলে?

খ) ‘যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন করেনা তার কোন দীন নেই’- হাদিসটি ব্যাখ্যা করো।

গ) দৃশ্যপট ১-এ কোন সুরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) ঘ) দৃশ্যপট -২-এ কোন সুরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন মাজিদকে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা হয় কেন?
২. সূরা আন-নাস -এর শিক্ষা জানা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জানে সমৃদ্ধ কর!” আয়াতটি ব্যাখ্যা করো।
৪. হাদিসকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখো।
৫. সমাজে মানুষের মাঝে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা জরুরি কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (خلاق)

মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন সুন্দর আচার-আচরণ। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার-ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ ঘটে সেসবের সমষ্টিই আখলাক। এটি শুধু মানুষের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা ও পরিবেশের সাথেও সুন্দর আচরণ প্রয়োজন।

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবার এবং সমাজবন্ধ হয়ে বাস করে। কখনো আখলাক (আচরণ) প্রশংসনীয় হয় আবার কখনো নিন্দনীয় হয়। প্রশংসনীয় আচরণকে আখলাকে হামিদাহ্ বা সচরিত্র বলে। আর নিন্দনীয় আচরণকে আখলাকে যামিমাহ্ বলে।

আখলাকে হামিদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণগুলো হলো সত্যবাদিতা, পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার, শিক্ষকদের সম্মান করা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সহপাঠীদের সাথে সদাচরণ, বড়োদের প্রতি শুন্দা ও ছোটোদের প্রতি মেহ ইত্যাদি।

আখলাকে যামিমাহ্ বা নিন্দনীয় আচরণগুলো হলো মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা, আমানতের খিয়ানত করা, গালি দেওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ইত্যাদি। এতিটি মানুষের আখলাকে হামিদাহ্ অর্জন ও আখলাকে যামিমাহ্ বর্জন করা উচিত। আমরা আখলাকে হামিদাহ্ অর্জন করব এবং আখলাকে যামিমাহ্ বর্জন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- আখলাকের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- সদাচরণের ধারণা ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ইসলামের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কতিপয় অসদাচরণের ধারণা, পরিণতি এবং এগুলো পরিহারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ধূমপান ও মাদকাসক্তির ধারণা ও কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- বাস্তব জীবনে সদাচরণে আগ্রহী হবো, অসদাচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে উদ্বৃদ্ধ হবো এবং নিকটতম ব্যক্তিদের ও বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করব;
- ধূমপান ও মাদকাসক্তিজনিত সামাজিক ক্ষতি এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে আগ্রহী হবো।

পাঠ ১

আখলাকে হামিদাহ্ (الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَ)

আখলাকে হামিদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণ মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ ভাব বজায় থাকে। পারস্পরিক লেনদেন সহজতর হয়। জীবন হয়ে ওঠে মধুময়। তাই সচরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, ‘কিয়ামতের দিন দাঁড়িগাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে মুমিনের উত্তম চরিত্র’ (তিরমিয়ি)।

মহানবি (স.) আরও বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে এই ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ঘার চরিত্র উত্তম’ (বুখারি ও মুসলিম)।

মহান আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। এগুলোর মধ্যে সচরিত্র একটি উত্তম নিয়ামত। সচরিত্র শিক্ষার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। পরিপূর্ণ সচরিত্রের প্রতীক ছিলেন তিনি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত : ২১)।

মহানবি (স.)-এর চরিত্রের মধ্যে সদাচরণের গুণগুলো পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) ঘোষণা করেন—

إِنَّمَا بِعِشْتُ لِأَنِّي مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : আমি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছি (মুসনাদে আহমাদ)।

আমাদের জন্য মহানবি (স.)-এর সমগ্র জীবনই উত্তম অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা মহানবি (স.)-এর জীবন অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ভালো অভ্যাস ও মন্দ অভ্যাসের তালিকা বা চার্ট তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২

সত্যবাদিতা (الصدق)

সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ হলো সিদক (صَدْقٌ)। এর অর্থ হলো সততা, সত্যবাদিতা, সত্য কথা বলা, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। বাস্তব বা প্রকৃত ঘটনা যথাযথ প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ মহৎঙ্গ আছে তাকে বলে সাদিক (صَادِقٌ) বা সত্যবাদী। যে সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে ও সম্মান করে। সত্যবাদী দুনিয়াতে যেমন সমানের অধিকারী হন তেমনিভাবে আবিরাতেও পরম সুখ লাভ করবেন। আমাদের খ্রিয় নবি (স.) বাল্যকাল থেকে সকলের নিকট সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই সবাই তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত এবং সম্মান করত। তিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেননি। প্রাণের শক্তি তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। যে সত্য কথা বলে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন—

فَإِنَّ الصِّدْقَ حَمَانٌ نِعْنَاءٌ وَإِنَّ الْكُبَرَ رَبِيْبَةٌ

অর্থ : সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সংশয় (তিরমিয়ি)।

সত্যবাদিতার উপকারিতা সম্পর্কে নবি করিম (স.) আরও বলেন, ‘তোমাদের অবশ্যই সত্যবাদী হওয়া উচিত। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য বেহেশতের পথে পরিচালিত করে।’ (বুখারি ও মুসলিম) পবিত্র কুরআনুল করিমে সত্যবাদীকে জান্নাত (বেহেশত) দানের কথা বলা হয়েছে—

هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَدُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا ط

অর্থ : এই তো সেদিন-যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত : ১১৯)।

বড়গীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর জীবনে সত্যবাদিতা সম্পর্কে একটি বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। তখন তিনি অঙ্গবয়স্ক বালক। শিশুর গ্রহণের জন্য তিনি বাগদাদ রওয়ানা হলেন। গমনের সময় মা তাঁকে সর্বদা সত্য কথা বলার আদেশ করেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত তাদের কাফেলার উপর হামলা করে। ডাকাত দল একে একে কাফেলার সকলকে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় বালক আব্দুল কাদিরকে জিজ্ঞাসা করল যে হে বালক, ‘তোমার কাছে কিছু আছে কি?’ তিনি নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, ‘চলিশটি স্বর্গমুদ্রা আছে।’ তাঁর কথা যাচাইয়ের জন্য ডাকাত সর্দার ধরক দিয়ে বলল, ‘কোথায় স্বর্গমুদ্রা? আমাদের তা দেখাও।’ তিনি তার জামার আঙ্গিনে সেলাই করা অবস্থায় ডাকাতদের তা বের করে দেখালেন। ডাকাতরা তাঁর সততা দেখে অবাক হয়ে বলল, ‘একপ লুকানো স্বর্গমুদ্রা আমরা খুঁজে পেতাম না, তুমি কেন বললে?’ তিনি বললেন, ‘আপনারা জিজ্ঞাসা করায় আমি সত্য কথা বলে দিয়েছি। কারণ আমার মা আমাকে সর্বদা সত্য কথা বলতে বলেছেন।’

আখলাক

ডাকাতরা বালক আব্দুল কাদিরের সততায় মুক্তি হয়ে নিজেদের পাপকর্ম সম্পর্কে অনুশোচনা করল। তারা ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সৎ পথে চলার প্রতিজ্ঞা করল। সত্যবাদিতা এভাবেই মানুষকে মৃক্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়।

আমাদের প্রতিজ্ঞা: সদা সত্য কথা বলব।

[শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একুপ আরও ছোটো ঘটনা বলে শুনাবে এবং তাদের একুপ আরও ছোটো ঘটনা বলার জন্য উদ্বৃক্ত করবে।]

কাজ : যদি বালক আব্দুল কাদির সত্য গোপন করত তাহলে কী ক্ষতি হতে পারত। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে খাতায় লিখে দেখাবে।

পাঠ ৩

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

সুন্দর পৃথিবীতে পিতামাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। আমাদের জীবনে তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি। জন্মের সময় আমরা ছিলাম অসহায়। আমরা নিজেদের প্রয়োজনের কথাও বলতে পারতাম না। পিতামাতা বুক ভরা মেহ-মমতা দিয়ে লালনপালন করে আমাদের বড়ো করে তোলেন। অসুখে-বিসুখে দিনরাত কষ্ট করে সেবাযত্ত করেন। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতামাতা আমাদের জন্য আল্লাহর সেরা দান। তাঁরা সর্বদা আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। পিতামাতার চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সুতরাং একুপ কল্যাণকামী পিতামাতার প্রতি আমাদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

কর্তব্য

পিতামাতার আদেশ-নিয়েধ পালন সন্তানের জন্য ওয়াজিব (কর্তব্য)। সেই সাথে পিতামাতার সেবাযত্ত করাও আমাদের কর্তব্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَإِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ إِنْ حَسَانًا

অর্থ: তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সম্মতবাহার করবে (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩)।

পিতামাতা বৃক্ষ হলে সন্তান তাঁদেরকে অধিকতর সেবাযত্ত করবে। তাঁদেরকে ধর্মক দেবে না বা মনে কষ্ট পায় একুপ কোনো কথা বা কাজ করবে না। তাঁদের সাথে উত্তম ও সম্মানজনক ভাষায় কথা বলবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّهُمَا فَلَا تَقْلِيلٌ لَّهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ: যদি পিতামাতার একজন অথবা উভয়ে তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের প্রতি তুমি বিরতিসূচক শব্দ ‘উহ’ উচ্চারণ করো না এবং তাঁদেরকে ধর্মক দিও না। তাঁদের সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলো (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩)।

তাঁদের উদ্দেশ্যে সর্বদা আল্লাহর নিকট আমাদের এই দোয়া করা উচিত—

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّنِي صَغِيرًا ۝

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার পিতামাতার প্রতি তেমনি সদয় হও! যেমনিভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে (আদরযত্তে) লালনপালন করেছেন (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৪)।

পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করা সন্তানের উপর কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

فُلْ مَا آنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَإِلَّوْا إِلَيْنَاهُ وَالآكْرَبُونَ

অর্থ : বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১৫)।

বার্ধ্যক্য অবস্থায় কিংবা অন্য কোন কারণে পিতামাতা আর্থিকভাবে অসহায় হলে তাঁদের ভরণ-পোষণ দেওয়া সন্তানের জন্য কর্তব্য। আমাদের দেশে এ বিষয়ে ‘পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩’ নামে একটি আইন রয়েছে। এ আইনে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করা, সন্তানকে পিতা-মাতার সাথে একই স্থানে বসবাস করা, তাঁদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খৌজ খবর রাখা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করা সন্তানের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পিতামাতার প্রতি সম্মত করা আমাদের কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (স.) যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া এক সাহাবিকে বলেন-

فَالْزَمْهَا فِإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَنِي

অর্থ : তুমি তোমার মায়ের সাথে থাকো। কেননা জাল্লাত তাঁর পায়ের নিচে (নাসাই)।

মহানবি (স.) আরও বলেছেন, ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি’ (তিরমিয়ি)।

পিতামাতার প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করা যায়।

পিতামাতা আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়মত। আমরা তাঁদের সাথে সম্মত করব। তাঁদের অবাধ্য হবো না। তাঁদের জন্য দোয়া করব।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পিতামাতার প্রতি
কী কী কর্তব্য রয়েছে তাঁর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৪

আত্মিয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য

আত্মিয় শব্দটি এসেছে আত্মা থেকে। আত্মার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আত্মিয় বলে। যাদের সাথে জীবনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাদের আমরা আত্মিয় বলি। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতা ও সন্তানের পর অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা অগ্রগণ্য তারাই আত্মিয়। যেমন : ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, শুশুর-শ্বাশুড়ি এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আপনজন।

ইসলামি সমাজে পিতামাতার ন্যায় আত্মিয়স্বজনের প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আত্মিয়দের মধ্যে যারা বড়ো তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো এবং যারা ছেটো তাদের অবশ্যই আদর ও মেহ করতে হবে। আত্মিয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। আত্মিয়দের মধ্যে গরিব-ধনী নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। গরিব ও অভাবগ্রস্ত আত্মিয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী :

وَأَتَيَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ: আল্লাহর ভাঙ্গোবাসা লাভের জন্য নিকট আত্মিয়দের দান করে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭৭)।

আত্মিয়রা রোগাক্রান্ত হলে তাদের সেবাযত্ত করতে হবে। বিপদে-আপদে খোঁজখবর নিতে হবে। আত্মিয়দের সাথে সম্বুদ্ধ করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন—

وَبِإِلَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ: পিতামাতার সাথে সম্বুদ্ধ করবে এবং নিকট আত্মিয়দের সাথেও উত্তম আচরণ প্রদর্শন করবে (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬)।

তিনি আরও বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ন্যায়বিচার কায়েম করতে, পরম্পরের প্রতি ইহসান বা উপকার করতে ও আত্মিয়স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিচ্ছেন (সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৯০)।

আত্মিয়দের কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া যাবে না। আত্মিয়দের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحْمٍ

অর্থ : যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মিয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না (বায়হাকি)।

কোনো অন্যায় বা অসৎ কাজে আত্মীয়কে সাহায্য করা যাবে না। বরং অন্যায় কাজ থেকে তাকে বিরত রাখাই দায়িত্ব। আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করলে পৃথিবীতে লাভবান হওয়া যায়। নবি কারিম(স.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করে (বুখারি ও মুসলিম)।

আত্মীয়স্বজনের সাথে আমরা সকলে ভালো ব্যবহার করব। তাদের গ্রাগ্য আদায় করব। তাদের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য সহযোগিতা করব। তাদের সকল বৈধ কাজে সহযোগিতা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আত্মীয়দের সাথে কীভাবে সদাচরণ
করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা সমাজবন্ধ হয়ে বাস করি। আমাদের আশপাশে আরও অনেক লোক বসবাস করে। আমাদের চারপাশে আরও যারা বসবাস করে তারা সকলেই আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, ‘সামনে পিছনে ডানে বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী।’

স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পাশাপাশি অবস্থানকারী কিংবা সাময়িকভাবে আশপাশে অবস্থানকারীকে প্রতিবেশী বলা হয়। এমনকি চলার পথের সহ্যাত্মাদেরও প্রতিবেশী বলা যায়।

কর্তব্য

আমরা মুসলমান। আমাদের চারপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যারা বসবাস করে তারা সবাই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীদের সাথে সম্মত ও সুন্দর আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ(স.)-এর বাণী:

خَيْرٌ لِّجِهِرٍ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ هُمْ كُلُّهُمْ

অর্থ: আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম (তিরমিয়ি)।

প্রতিবেশীকে বিপদে-আপদে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে আরও বলেন, ‘সেই ব্যক্তি আমার উপর প্রকৃত ইমান আনেনি যে আরামে রাত কাটায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত।’ (দারিয়ি)

অসুখে-বিসুখে প্রতিবেশীর খৌজখবর নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা উচিত নয়, তাদের মঙ্গল কামনা করা, কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া এবং অন্যায়-অত্যাচার না করা আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে রাসুল (স.) বলেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمُنُ جَارِهَ بِوَاقِفَةٍ

অর্থ : সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে নিরাপদ নয় (মুসলিম)।

প্রতিবেশীদের একজনের হক অন্যজনের কাছে আমানতস্বরূপ। এ আমানতকে অবশ্যই হেফাজত করতে হবে। প্রতিবেশী যে কেউ কিংবা যেমনই হোক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকলকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

প্রতিবেশীকে প্রথমে সালাম দেওয়া এবং খানা-পিনায় শরিক করা প্রতিবেশীর কর্তব্যের শামিল। তাদের মাঝে উপহার উপটোকন বিনিময় করাও প্রতিবেশীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশীকে কোনোরূপ ঘৃণা করা যাবে না এবং হীন ও নগণ্য মনে করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

প্রতিবেশীর হক হলো, সে যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তুমি তার সেবা করবে। সে মরে গেলে তার লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে, কাফন দাফনে অৎশঁগ্রহণ করবে। সে যদি অর্থ অভাবে পড়ে, তাহলে তুমি তাকে খণ্ড দেবে, সে যদি পরনের জন্য কাপড় সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে তুমি তাকে কাপড় সংগ্রহ করে দেবে। আর যদি কোনো কল্যাণ হয় তুমি তাকে মুবারকবাদ জানাবে। সে যদি কোনো বিপদে পতিত হয় তবে তুমি তার দুঃখের ভাগ নেবে, সহানুভূতি জানাবে। তোমার ঘর তার ঘর থেকে উঁচু বানিয়ে তাকে মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত করবে না। তোমার রান্নার পাত্রের বাতাস দিয়েও তাকে কষ্ট দেবে না। যদি তেমন অবস্থা হয়ই তাহলে তাকে এক চামচ খাবার পাঠিয়ে দেবে (তাবারানি)।

প্রতিবেশী অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র বা শ্রমজীবী হলেও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। তাদের পেশাকে সম্মান করতে হবে। সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে হবে, সম্মানের সাথে তাদের সম্মৌখন করতে হবে।

আমরা প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকব। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াব। তাদের সাথে বাগড়া বিবাদ করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সুফল সম্পর্কে দলীয়ভাবে পাঁচটি করে বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটোদের প্রতি স্নেহ

মানব চরিত্রের একটি প্রশংসনীয় আচরণ হলো বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটোদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা। একজন আদর্শ মানুষ বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের স্নেহ করেন। প্রিয় নবি (স.) বড়োদের সম্মান করতেন এবং ছোটোদের আদর করতেন। তিনি সর্বদা ছোটোদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের স্নেহ করার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে ছোটোরা বড়োদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখে এবং বড়োরা ছোটদের স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন। ফলে সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মহানবি (স.) বলেন—

لَيْسَ مِنَ الْمُمْكِنِ حَمْصَغِيرَتَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَتَا

অর্থ : মে ব্যক্তি আমার উন্মত্তের মধ্যে গণ্য নয় যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়োদের শ্রদ্ধা-সম্মান করে না (তিরমিয়ি)।

বড়োদের সালাম প্রদান করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সৌজন্য বজায় রেখে কথাবার্তা বলা, প্রয়োজনে বড়োদের কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা এবং বসা থাকলে উঠে তাদের বসার ব্যবস্থা করা ছোটোদেরও মানবিক কর্তব্য।

বড়োদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পরকালে বিশেষ সাওয়াব অর্জিত হবে এবং জাল্লাত লাভ সহজ হবে। ছোটোদের আদর সোহাগ করা, তাদের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করা বড়দের কর্তব্য। এতে ছোটোদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

প্রিয় নবি (স.) বলেছেন—

কোনো বৃক্ষকে যদি কোনো যুবক বার্ধক্যের কারণে শ্রদ্ধা করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ঐ যুবকের জন্য বৃক্ষ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে (তিরমিয়ি)।

কাজ : শিক্ষার্থীরা চার-পাঁচজন করে দলে বিভক্ত হয়ে বড়োদের প্রতি ছোটোদের করণীয়গুলো পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

সহপাঠীদের সাথে সম্বন্ধবহার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে মিলেমিশে কাজকর্ম করতে হয়। আমরা যে স্কুল বা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি, সেখানে আমাদের সাথে আরও অনেকে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ে আমরা যাদের সাথে একই শ্রেণিতে লেখাপড়া করি তারা সকলেই আমাদের সহপাঠী। সহপাঠীদের সাথে আমাদের আন্তরিক ও মধুর সম্পর্ক রয়েছে। সহপাঠীরা আমাদের ভাইবনের মতো। স্কুলে আমরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখি। স্কুলে আমাদের সহপাঠীদের কেউ অসুস্থ হলে সেবা করা আমাদের কর্তব্য। প্রয়োজনে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্ৰী, যেমন : বই, খাতা, কলম, পেনসিল কারো না থাকলে তাকে দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে কারো মন খারাপ হলে, বিষণ্ণ বা চিকিৎসিত হলে তার বিষণ্ণতার ভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সহপাঠীদের সাথে উভয় আচরণ করা উচিত। তাদেরকে উভয় শব্দে সম্বোধন করতে হবে।

কাউকে খাটো করে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে, একে অপরকে মর্যাদা দিতে হবে। সহপাঠীদের সাথে কটুবাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কারো মনে কষ্ট পেতে পারে এমন কোনো আচরণ থেকে বিরত থাকব। কেউ কোনো বিপদে পতিত হলে বিপদ দূর করার চেষ্টা করব। কারো ব্যথায় সান্ত্বনা দেবো। কাউকে উপনামে ডাকব না। কারো পিছনে লাগব না। দোষ-ক্রটি ধরে লজ্জা দেবো না।

সহপাঠীদের সুখে আমরা সুখী হই আবার কারো কোনো দুঃসংবাদ শুনলে আমরা ব্যথিত হই। ধৈর্য-ধারণের পরামর্শ প্রদান করি। কখনো কোনো সুখবর পেলে আমরা তার আনন্দে শরিক হই।

সহপাঠীদের সাথে সম্বন্ধবহার করলে বা সম্পর্ক থাকলে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ভালো থাকে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর হয়। সুশিক্ষার জন্য এটা খুব প্রয়োজন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের
প্রতি কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮

আখলাকে যামিমাহ (الْأَخْلَاقُ الدِّمِيَّةُ)

আখলাকে যামিমাহ অর্থ হলো অসদাচার বা নিন্দনীয় আচরণ। এমন কতগুলো নৈতিক অবক্ষয়মূলক আচরণ যা মানুষকে হীন, নীচ, ইতর শ্রেণিভুক্ত ও নিন্দনীয় করে। মিথ্যাচার, গিবত, পরনিন্দা, গালি দেওয়া ইত্যাদি আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় আচরণ। এগুলো বর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَلِبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ : তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিত করো না এবং তোমরা জেনে-শুনে সত্য গৌপন করো না
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪২)।

এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তির সম্মান সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে' (বুখারি ও মুসলিম)।

আমাদের প্রিয় নবি যাবতীয় নিন্দনীয় আচরণ থেকে পবিত্র ছিলেন, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। কাউকে তিনি কখনো গালি দেননি। ওয়াদা ভঙ্গ করেননি, কারো সাথে প্রতারণা করেননি।

আমরা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ সকল আদর্শ অনুসরণ করব।

আমাদের প্রতিজ্ঞা—

- আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলব না।
- ওয়াদা ভঙ্গ করব না।
- প্রতারণা করব না।
- কারো গিবত করব না।

পাঠ ৯

মিথ্যাচার (الكُنْبُ)

মিথ্যা সকল পাপ কাজের জন্মী। প্রকৃত অবস্থা বা ঘটনাকে বিকৃত করে পরিবেশন করাকে মিথ্যাচার বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে বা প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটায় তাকে মিথ্যাবাদী বলে।

মিথ্যা একটি জগন্যতম অপরাধ। এটি সকল পাপ কাজের মূল। মিথ্যা থেকে পাপ কাজের সূচনা হয়। প্রতারণা, প্রবৰ্ধনা, অন্যের মাল অপহরণ এ সকল অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মের মূলে রয়েছে মিথ্যাচার। যে সমাজে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পায় সে সমাজ ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

মিথ্যাচার একটি নিন্দনীয় আচরণ। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ বিশ্বাস করে না। বিপদের সময় তাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। সকলে তাকে দুঃখ করে। তার কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। পরিণামে দুনিয়াতে তার জীবন দুর্বিষ্ফ হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ তায়ালা তার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। আর তাই পরকালে তার স্থান হবে জাহানাম।

মহানবি (স.) এ বিষয়ে বলেন—

إِيَّا كُمْ وَالْكَنْبِ فِيَّنَ الْكَنْبِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

অর্থ: আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর পাপ কাজ জাহানামের পথে ধাবিত করে (মুসলিম)।

মিথ্যা বর্জন করা কর্তব্য। মিথ্যা পরিত্যাগ করলে সকল পাপ থেকে বঁচা যায়। মিথ্যাবাদীর কাছ থেকে রহমতের ফেরেশতারাও দূরে সরে যান। মহানবি (স.) বলেছেন, ‘বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে, ফেরেশতারা তখন এর দুর্গম্বের কারণে তার থেকে দূরে চলে যান’ (তিরমিয়ি)।

আমাদের প্রিয় নবি (স.) কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তিনি স্বার্থের পরিপন্থী হলেও কখনো মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতেন না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সত্যের উপকারিতা এবং মিথ্যার অপকারিতার উপর একটি পোস্টার লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

গিবত বা পরনিন্দা (الغيبة)

গিবত একটি সামাজিক অনাচার। কারো অগোচরে তার দোষ-ত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশকে গিবত বলে। একে পরনিন্দাও বলা যায়। গিবত একটি ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ। এটি কবরিণ গুনাহ। এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘গিবত কী তা কি তোমরা জানো?’ লোকেরা উত্তরে বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।’ রাসূল (স.) বললেন, ‘গিবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।’ জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কি গিবত হবে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ‘তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই গিবত হবে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তা হবে ‘বুহতান’ বা ‘অপবাদ’ (মুসলিম)।

গিবত একটি নিন্দনীয় কাজ। গিবতের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে বাগড়াফ্যাসাদসহ নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়।

পরিত্র কুরআনুল করিমে গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী :

“তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত থেতে চাইবে, নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে” (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত : ১২)।

গিবত করার মতো গিবত শোনাও পাপের কাজ। কেউ গিবত করলে তাকে গিবত থেকে বিরত রাখা কর্তব্য। তাহলে গিবতচর্চা সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে বা দূরীভূত হবে।

সর্বাবস্থায়ই গিবত বা পরনিন্দা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ কোনো অবস্থায়ই গিবত জায়েজ বা বৈধ নয়। কেউ যদি গিবত করে তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার গিবত করা হয়েছে তার থেকে অবশ্যই মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর যদি সে মারা যায়, তার থেকে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের দোয়া করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘নিঃসন্দেহে গিবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গিবত বা কৃৎসা রঞ্জনা করেছ তার জন্য এভাবে দোয়া করবে: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।’

এক মুসলমানের সম্পদ, জীবন ও সম্মান অপর মুসলমানের কাছে পরিত্র আমানত। গিবত অপর মুসলমান ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করে বিধায় এটি ইসলামে হারাম।

গিবত ব্যভিচার থেকেও অধিকতর অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘গিবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ’ (আল-মুজামুল আওসাত)।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কী কী কাজ গিবত বা পরনিন্দার মধ্যে পড়ে, তার
একটি চার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

গালি দেওয়া (الْسَّبُّ)

কাউকে মন্দ নামে ডাকা, মন্দ কথা বলা, তিরক্ষার করা, অশালীন বা অশ্লীল কথা বলা হলো গালি দেওয়া। কারো সম্পর্কে এরূপ বাক্য ব্যবহার করা যাতে তার হীনতা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় তাও গালিস্পরূপ। কাউকে গালি দেওয়া বা মন্দ নামে ডাকা নিন্দনীয় কাজ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘ইমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ’ (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত : ১১)।

মানুষ সভ্যজাতি, তারা কাউকে গালি দেবে না। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সাথে মতের অমিল থাকতে পারে। একে অপরের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। একের সাথে অন্যের কথা কাটাকাটি হতে পারে। কিন্তু তাতে একে অন্যকে অশালীন বা অশ্লীল কথা বলে গালি দেওয়া উচিত নয়। অশালীন কথা বলা নিতান্তই খারাপ কাজ। যে গালি দেয়, অশালীন কথা বলে, সে সমাজে ঘৃণিত। তাকে মানুষ পছন্দ করে না। সমাজে তার কোনো সমাদর থাকে না। তার সাথে কেউ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে না। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.), গালি দিতে বা গালিগালাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন—

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالٌ كُفُرٌ

অর্থ : মুসলমানদের গালি দেওয়া পাপ এবং হত্যা করা কুফরি (বুখারি ও মুসলিম)।

কেউ যদি গালি দেয় তবে তার উত্তরে গালি দেওয়া উচিত নয়।

একবার মহানবির কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল আমাকে আমার সম্প্রদায়ের এমন এক ব্যক্তি গালি দেয় যে আমার থেকে নীচু। এর প্রতিশোধ নিতে আমার কোনো বাধা আছে কি?’ রাসুলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, ‘পরস্পর গালমন্দকারী উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং একে অপরের দোষারোপ করে’ (বুখারি ও মুসলিম)।

গালি সম্পর্কে আরও বলেছেন, পিতামাতাকে গালি দেওয়া মহাপাপ। সাহাবিগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল এমন কোনো নরাধম আছে যে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়?’ তিনি বললেন, ‘যে অপরের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং অপরও তার পিতামাতাকে গালি দেয়’ (বুখারি ও মুসলিম)।

হাদিস থেকে এটাই থ্রাণিত হয় যে, অন্যের পিতামাতাকে গালি দেওয়া মানে নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া। সমাজ গালিমুক্ত করতে গালির উত্তরে গালি দেবো না, এতে গালমন্দকারী লজিত ও অনুতঙ্গ হবে। গালমন্দ ভালো কাজ নয়, গালমন্দের ন্যায় অশালীন কাজ হতে আমরা বিরত থাকব।

কাজ : শ্রেণিকচ্ছে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে গালির
ক্ষতিকারক বা কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১২

ধূমপান ও মাদকাস্তি

এই অপরূপ সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু বস্তু মানুষের খাদ্য হিসেবে বৈধ বা হালাল করেছেন। আর যা মানুষের খাদ্য হিসেবে কল্যাণকর নয় তা অবৈধ ও হারাম করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী, “তোমরা উভয় ও পবিত্র জিনিস খাও, তোমাদেরকে যা আমি রিজিক হিসেবে দান করেছি” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭২)।

খাদ্য এহণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধিনিয়েধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ অসৎ সঙ্গ ও কুপ্রোচনায় নানা ধরনের ক্ষতিকর হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে তার নিজের, পরিবারের ও সমাজের বিরাট ক্ষতি হয়।

মাদকাস্তি ও ধূমপান মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো নেশাজাতীয় দ্রব্য। তাই এগুলো নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

كُلْ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلْ حَمْرٍ حَرَامٌ

অর্থ : নেশাজাতীয় যেকোনো দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম (মুসলিম)।

ধূমপান

মানুষের ক্ষতিকর বদঅভ্যাসগুলোর মধ্যে ধূমপান অন্যতম। ছক্কা, বিড়ি, চুরুট, সিগারেট ধূমপানের মধ্যে পড়ে। এতে যেমন শারীরিক ক্ষতি হয় তেমনি অর্থেরও অপচয় হয়। অপব্যয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অপব্যয়কারীকে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ الْمُبَتَّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

অর্থ : নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৭)।

আল্লাহ আরও বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অপব্যয়কারীকে ভালোবাসেন না।” ‘ধূম’ কোনো খাবারের মধ্যে পড়ে না। এটি ক্ষুধা বা তৃষ্ণাও মেটায় না। এর দ্বারা কোনো উপকার হয় না বরং এটা মারাত্মক শারীরিক ক্ষতিসাধন করে এবং এর দ্বারা প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। এ অপব্যয় মেটাতে ধূমপায়ীরা নিজেদের পরিবারে অর্থের সংকট ঘটায়। আত্মস্বজ্ঞনের সাথে অসদাচরণ করে। এ অপব্যয়ের অর্থ সংকুলানের জন্য নানা ধরনের অবৈধ পথে পা বাঢ়ায়। ফলে সামাজিক অনাচার সৃষ্টি হয়। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। ধূমপানের আর একটি ক্ষতির দিক হলো এটা খুব খারাপ গন্ধ ছড়ায়, যা অপরের জন্য ক্ষতিকর। এটা মানবাধিকারেরও পরিপন্থি।

মহানবি (স.) বলেছেন, ‘মুখে দুর্গন্ধি নিয়ে যেন কেউ মসজিদে না যায়’ (নাসাই)।

মুখে দুর্গন্ধি থাকলে মসজিদে অন্য নামাযির কষ্ট হয়। এমনিভাবে যানবাহনে ও সভা-সমিতিতে অন্য মানুষ ধূমপার্যাদের মাধ্যমে কষ্ট পায় যা ইসলামে অবৈধ করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ‘ধূমপানে বিষপান’ কারণ এতে বিষ আছে। নিকোটিন জাতীয় বিষ যা ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দেয়। ধূমপানের ফলে মানুষের শরীরে নানারকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন : নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, এংকাইটিস, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যালসার, গ্যাস্ট্রিক, ক্ষুধামাল্য, হৃদরোগ প্রভৃতি। ধূমপান পরিবেশকে নষ্ট করে। ধূমপানের সংস্পর্শে যারা আসে—মহিলা, শিশু, অধূমপার্যাদের সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুটি সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন থাকে তা যদি কোনো মানুষের শরীরে ইনজেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে সে অবশ্যই মারা যাবে।

ধূমপানের ফলে ইবাদতেও বিষ্ফল সৃষ্টি হয়। ধূমপার্যার মুখের দুর্গন্ধি মুসলিমদের ইবাদতেও বিষ্ফল সৃষ্টি হয়।

মাদকাস্তি

সাধারণত যে সকল খাদ্যবস্তু বা পানীয় মন্তিক্ষে বিকৃতি ঘটায়, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয়, দেহ ও মনে বিবৃত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেগুলো গ্রহণ করাকে মাদকাস্তি বলে। মাদকাস্তি একটি জগন্য বদঅভ্যাস। এ সম্পর্কে হ্যারত উমর (রা.) বলেছেন—

‘যা জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয় তা মাদকদ্রব্য’ (বুখারি)।

মহানবি (স.) আরও ঘোষণা করেন—

‘যেই বস্তুর বেশি পরিমাণের মধ্যে মাদকাস্তির কারণ রয়েছে, তার অঙ্গ পরিমাণও হারাম’ (তিরমিয়ি)।

নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, ভাঁ, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন, সঞ্জীবনী সূরা, বিভিন্ন প্রকার আ্যালকোহল ইত্যাদি। ওষুধ হিসেবে এগুলোর কিছু কিছু ব্যবহার করা হয়। তবে নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মৃত্তিপূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর, ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে”(সূরা আল-মায়দা, আয়াত : ৯০)।

মাদকদ্রব্যের কুফল মানবজীবনে মারাত্মক বিপজ্জনক। যদিও সাময়িকভাবে মাদক আনন্দ দেয় বা শক্তি দেয়। কিন্তু এর ক্ষতিকর দিক খুবই সুদূরবিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী। এ নেশার ফলে ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, হত্যাসহ নানাপ্রকার সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও মাদকাস্তি ব্যক্তি অপুষ্টি, কৃচিহ্নিতা, শারীরিক শীর্ণতা, লিভার ও কিডনি নষ্ট, ওজন কমে যাওয়া, শ্বাসনালির ক্ষতি প্রভৃতি সমস্যায়

ভোগে। কফ, কাশি, যষ্টা ইত্যাদি রোগে দ্রুত আঢ়ান্ত হয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি নামায, রোয়া এবং ঘাবতীয় ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। সে সবসময় অসুস্থ থাকে। মাদকের নেশা তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে, আর তাই সে পরকালে মহাশান্তি ভোগ করবে। মহানবি (স.) বলেছেন —

‘মাদকাসক্ত ব্যক্তি জাগ্নাতে প্রবেশ করবে না’ (দারিমি)।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে ধূমপানের অপকারিতাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. হামিদাহ্ শব্দের অর্থ কী?

- ক) অনুসরণীয়
- খ) নিষ্পন্নীয়
- গ) অনুকরণীয়
- ঘ) প্রশংসনীয়

২. গিবতের ফলে—

- i) ব্যক্তি জাহান্নামি হবে
- ii) সামাজিক বিশ্রংখলা সৃষ্টি হবে
- iii) রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাঘাত ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উচ্চীপক্ষ পঢ়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব ‘ক’ কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারমান। তিনি তাঁর একালায় দরিদ্রদের ঘর বানিয়ে দেন। বেকারদেরকে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি দেন। বিপদে আপদে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন। অপরদিকে জনাব ‘খ’-এর বক্তু জনাব ‘খ’ তাঁর বোন শাহেলার স্থামী মারা ঘাওয়ার পর তার সন্তানদের ভরণপোষণ ও পড়ালেখার যাবতীয় খরচ তিনি বহন করেন।

৩. জনাব ‘ক’ -এর কর্মকাণ্ডে আখলাখে হামিদাহ’র কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

- ক) সত্যবাদিতা
- খ) প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য
- গ) আঞ্চীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য
- ঘ) ছোটোদের প্রতি ভালোবাসা

৪. জনাব ‘খ’ -এর কর্মকাণ্ডে আখলাখে হামিদাহ’র যে গুণটি ফুটে উঠেছে, ফলে তার-

- i. আয়ু বৃদ্ধি পাবে
- ii. সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে
- iii. ইহকালীন শান্তি অর্জিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১)

‘ক’ ও ‘খ’ একই মহল্লায় বসবাস করে। ‘ক’ একদিন আগুন আগুন বলে চিৎকার করতে থাকে। সবাই তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে সে হাসতে হাসতে বাসায় চলে যায়। ‘খ’ একদিন অফিস থেকে এসে দেখেন তার মা কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। তিনি তার মায়ের মাথায় পানি ঢালতে থাকেন এবং খাবার ও ঔষধ খাইয়ে দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ‘খ’-এর মা সুস্থ হয়ে উঠেন।

- ক) আখলাকে যামিমাহ কী ?
- খ) সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা সংশয়- ব্যাখ্যা করো।
- গ) ‘ক’-এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহ’র কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ) ‘খ’ -এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদা’র যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে এর তাংপর্য ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের মেহ করা জরুরি কেন?
২. সহপাঠীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. গিবত বৈধ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
৪. মাদক দ্রব্য মানব জীবনে বিপদজনক কেন? ব্যাখ্যা করো।
৫. গালি থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

আদর্শ জীবন বলতে বোঝায় যে জীবন অনুসরণ করলে জীবন সুন্দর ও সুগঠিত হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের জীবনচরিত অন্যের জন্য আদর্শ। সুতরাং বাস্তব জীবনে এসব মনীষীর সমাজসেবামূলক কাজ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মায়াগ, ক্ষমা, পরমতসহিষ্ণুতা ও দেশপ্রেমসহ অন্যান্য গুণ অনুসরণ করলে সুন্দর সুশ্রেষ্ঠ ও সফল জীবন লাভ করা যায়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- আদর্শ জীবনচরিতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর পরিচয়, সততা, বিশ্বাস্তা, সমাজসেবা, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও তাঁর অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- পরিচয়সহ হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর দানশীলতা, ত্যাগ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারব;
- সাম্য, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, দেশপ্রেম ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় হ্যরত উমর ফারক (রা.)-এর অবদান উল্লেখ করতে পারব;
- হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর পরিচয়, দানশীলতা, সহমর্মিতাসহ তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- হ্যরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর পরিচয়, ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর আবদান বর্ণনা করতে পারব;
- হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর পরিচয়, মানবপ্রেমসহ তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ

আরবের অবস্থা

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মের সময় আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ ও জয়ন্ত। আরবের লোকেরা ছিল নানা পাপে লিঙ্গ। মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুঠন, দুর্বীলি ও অরাজকতা করে তাদের জীবন চলত। তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। সমগ্র আরবদেশ বর্বরতা ও অকৃতি পূজায় নিমজ্জিত ছিল। কাব্যচর্চা, গান ও বাগীতায় অগ্রসর থাকলেও নৈতিক চরিত্রে আরব সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল। হাটে-বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হতো। এদের জীবন-মৃত্যু মনিবের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করত। মনিবরা এদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালাত। ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার ছিল না। এমনকি সে সময় জীবন্ত মেয়ে শিশুদের গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হতো। এক্লপ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-কে পাঠান। তাঁর আগেও পৃথিবীতে আরও অনেক নবি-রাসূল এসেছেন। আমাদের নবি হলেন সর্বশেষ নবি। সকল নবির সেরা নবি, বিশ্বনবি।

জন্ম ও পরিচয়

হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের প্রিয় নবি। তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। জন্মগ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ও আহমাদ।

মহানবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পাদ্রি বুহাইরার ভবিষ্যদ্বাণী

আরবদের বনু সার্দ গোত্রের মেয়ে ধাত্রী হালিমার উপর শিশু মুহাম্মদের লালনপালনের দায়িত্ব পড়ে। তিনি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে নিজের সন্তানের মতো মেহ-মমতায় লালনপালন করেন। এরপর মুহাম্মদ (স.) মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন। তিনি মা আমিনার সীমাহীন আদরযত্নে বড় হতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কপালে এ আদরও বেশিদিন জুটল না। তাঁর মাও মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। অল্প বয়সেই তিনি পিতামাতা উভয়কে হারিয়ে ইয়াতিম হয়ে যান। বিশ্বের বুকে তিনি তখন একা, নিঃসঙ্গ ও অসহায় বালক। উন্মে আয়মান নামক একজন পরিচারিকা তাঁকে দাদা আব্দুল মুতালিবের হাতে তুলে দেন। দাদা অত্যন্ত আদরযত্নে তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন দাদাও তাঁকে ছেড়ে পরলোকগমন করেন। এবার তিনি চাচা আবু তালিবের হাতে বড় হতে থাকেন। চাচার সৎসারে ছিল অভাব-অন্টন। তিনি চাচার ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করতেন ও মেষ চৰাতেন। চারিত্রিক সকল ভালো গুণ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি অহংকার, অপব্যয়, অর্থহীন ও অনৈতিক কথা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন এবং তিনি অন্যের দোষ খোঝা ও কাউকে লজ্জা দেওয়া থেকেও বিরত থাকতেন। সর্বদা মানুষের সাথে হাশিখুশি কথা বলতেন। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতেন। মানবতার কল্যাণে নিজের সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। তাঁকে আপন-পর সকলেই আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন। এক কথায় তিনি পৃথিবীর সকল প্রাণী ও জীবজগতের উপকারী বন্ধু ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন তখন চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া রওয়ানা হলেন। তিনি বসরায় পৌছলে বুহাইরা (জারজিস) নামক একজন খ্রিস্টান পাদ্রির সাথে দেখা হয়। তিনি মুহাম্মদ (স.)-কে চিনতে পেরে বলেন, ইনিই শেষ জামানার নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। পাদ্রি আবু তালিবকে বলেন, ওকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন, ইহুদিরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। এ পরামর্শ অনুযায়ী চাচা আবু তালিব কয়েকজন ভূত্যের সঙ্গে প্রিয় ভাতিজাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)

ওকাজ মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়। তা একটানা পাঁচ বছর চলতে থাকে। এতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। মহানবি (স.) এসব হানাহানি ও রক্তারণি অবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি শান্তিকামী কয়েকজন যুবককে নিয়ে ‘হিলফুল ফুয়ুল’ নামে একটি শান্তিসংঘ গঠন করেন। এর মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরবের চলমান হিংসা-বিদ্রোহ, মারামারি ও হানাহানি বন্ধ করতে আগ্রান চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে সমাজে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভাতৃত্ব ও গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আপন-পর সকলেই তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুরাইশগণ বহুদিনের পুরাতন কাবা ঘর সংস্কারের কাজ হাতে নিল। কাবা ঘর সংস্কারের কাজ সমাপ্ত হলো। কিন্তু পবিত্র হাজরে আসগুয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন করা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বাগড়ার সৃষ্টি হলো। এ বাগড়া বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে পড়ল। অত্যেকেই এ পাথর স্থাপনের মতো মহৎ কাজের অংশীদার হতে চাইল। কেউ ছাড় দিতে রাজি হলো না। তাই গোত্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আগামী দিন সকালবেলা সবার আগে যিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করবেন তিনিই এ বিবাদ মীমাংসা করবেন। তিনি যা সিদ্ধান্ত দেবেন সকলেই তা মেনে নেবে। সকালবেলা দেখা গেল হ্যরত মুহাম্মদ (স.) সবার আগে কাবা ঘরে প্রবেশ করেছেন। এটা দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করল এবং বলে উঠল, ‘আল-আমিন এসেছেন, সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।’ হ্যরত মুহাম্মদ (স.) একখানা চাদর বিছিয়ে নিজ হাতে পাথরটি চাদরের মাঝখানে রাখলেন। তারপর সকল গোত্রের সরদারকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। তারা সকলে মিলে চাদরটি বহন করে যথাস্থানে নিয়ে গেল, হ্যরত মুহাম্মদ (স.) নিজ হাতে পাথরখানা কাবাৰ দেয়ালে পিসিয়ে দিলেন। ফলে জাতি একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হতে বেঁচে গেল এবং সকলে পাথরটি বহনের সম্মান পেয়ে খুশি হলেন।

নবুয়তপ্রাপ্তি ও আরবের লোকদের প্রতিক্রিয়া

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) শৈশবকাল হতেই মানুষের মুক্তি ও শান্তির কথা ভাবতেন। যুবক বয়সে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হতে থাকে। হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহের পর তিনি সাধনা ও ধ্যান আরও বাড়িয়ে দেন। তিনি মক্কার অদূরে হেরো গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন, কীভাবে মানবজাতিকে মৃত্তিপূজা, অগ্নিপূজা ও শিরক হতে মুক্ত করবেন ও এক আল্লাহর পথে নিয়ে আসবেন। এভাবে তিনি হেরো গুহায় প্রায় ১৫ বছর ধ্যানমগ্ন থাকেন। মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন, অবার হেরো গুহায় পিয়ে ধ্যানে মগ্ন হতেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসের ২৭ তারিখ তিনি নবুয়ত লাভ করেন।

নবুয়ত লাভের পর তিনি লোকদের এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেন। মক্কার কাফিররা তাতে বাধা দেয়। তাই তিনি গোপনে ইসলামের পথে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। আরবের প্রভাবশালী মহল সবসময় তাঁর কাজের বিরোধিতা করতে থাকে। তারা হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুসারিদের নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত দৈর্ঘ্যসহকারে তাদের অত্যাচার সহ্য করেন এবং নীরবে এক আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহবান করতে থাকেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আরব সমাজের কুসংকার দূর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠ ২

হয়রত আবু বকর (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

হয়রত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি মকার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম আব্দুল্লাহ, উপাধি সিদ্বিক ও আতিক। পিতার নাম উসমান, ডাকনাম আবু কুহাফা এবং মাতার নাম সালমা, ডাকনাম উম্মুল খায়ের। তাঁরা হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হয়রত আবু বকর (রা.) ছিলেন বয়সের দিক থেকে হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর চেয়ে তিনি বছরের ছোট। মহানবি (স.)-এর প্রায় সমবয়সী হওয়ায় হয়রত আবু বকর (রা.)-এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি উম্মুল মুমিনিন হয়রত আয়েশা (রা.)-এর পিতাও হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর শঙ্কর।

ইসলাম গ্রহণ

পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হয়রত আবু বকর (রা.)। তিনি রাসূল (স.)-কে খুব বিশ্বাস করতেন। একদা তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামেনে গমন করেন। মকাব ফিরে শুনলেন হয়রত মুহাম্মদ (স.) নবি দাবি করছেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করছেন। তিনি রাসূল (স.)-এর দরবারে হাজির হয়ে কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

চরিত্র ও গুণাবলি

হয়রত আবু বকর (রা.) ছিলেন স্বল্পভাষী, সাহসী, দৈর্ঘ্যশীল, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ছিল তাঁর অট্টল বিশ্বাস। রাসূল (স.)-এর মে'রাজের (উর্ধ্বগমন) ঘটনা অকপটে একমাত্র তিনিই বিশ্বাস করেন। তাই তিনি সিদ্বিক উপাধিতে ভূষিত হন। সততা, ধর্মভীকৃতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। দুঃখী ও আর্তের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। এজন্য তিনি আরব সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ছিলেন ন্যূন ও ভদ্র প্রকৃতির লোক। কুরআন পাঠের সময় তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্র বরতো। ইসলামের সেবায় হয়রত আবু বকর সিদ্বিক (রা.)-এর দান অতুলনীয়। তিনি ইসলামের জন্য তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মসজিদে নববি ও হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর বাসগৃহ নির্মাণ এবং তাবুক অভিযানে তিনি অর্থ ব্যয় করেন। তিনি হয়রত বেলাল (রা.)-সহ অসংখ্য ঝীতদাসকে ক্রয় করে স্বাধীন ও মুক্ত করে দেন।

ইসলাম প্রচার

ইসলাম গ্রহণের পর হয়রত আবু বকর সিদ্বিক (রা.) রাসূল (স.)-এর সঙ্গে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। মকাব আশপাশের গোত্রে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। হজের মৌসুমে বিভিন্ন তাঁরুতে গিরেও তিনি ইসলামের প্রতি লোকদের আহবান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক উসমান (রা.), যুবাইর (রা.), আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.), সাদ (রা.), তালহা (রা.)-এর মতো আরও অনেক সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মদিনায় হিজরত

হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর হিজরতের সাথী ছিলেন। রাসুল (স.) হিজরতের আদেশপ্রাপ্ত হন এবং হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে অবগত করেন। তিনি রাসুল (স.) থেকে হিজরতের কথা শুনার পর রাত্রে আর ঘুমাতেন না, অপেক্ষায় থাকতেন কখন রাসুল (স.) এসে তাঁর সাথে হিজরত করার জন্য ডাক দেবেন। গভীর রাত্রে তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ডাকে সাড়া দেন এবং উভয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে তাঁরা কাফির শক্রদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাওর নামক পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। সেখান থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

খলিফা নির্বাচন

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের পর হ্যরত উমর (রা.) ও অন্য সাহাবিগণ হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে পরামর্শ করে তাঁকে ৮ই জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নির্বাচন করেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সময় কিছু লোক নবি হওয়ার মিথ্যা দাবি করে, আবার কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কঠোরভাবে সমস্ত বিশ্বজ্ঞলা দূর করেন ও শান্তি স্থাপন করেন। তাঁর শাসনামলে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে অনেক হাফিয় ও কুরাই সাহাবি শহিদ হন। এরপর তিনি কুরআন সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করার জন্য হ্যরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে নির্দেশ দেন। হ্যরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন সাহাবি থেকে গাছের বাকলে, পশুর হাড় ও চৌমড়ায় এবং মসৃণ পাথরে লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্রহ করেন।

ওফাত

হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ২৩শে আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তিকাল করেন। তাঁকে হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর কামরায় হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর পাশে মদিনায় সমাহিত করা হয়।

রাসুল (স.)-এর ওফাতের পর হ্যরত আবু বকর (রা.) ইসলাম রক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আদর্শ সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর চরিত্রের দুটি গুণ লিখে একটি প্ল্যাকার্ড তৈরি করবে।

পাঠ ৩

হ্যরত উমর ফারঞ্জক (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

হ্যরত উমর ফারঞ্জক (রা.) ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম আবু হাফ্স, পিতার নাম খাতাব, মাতার নাম হান্তামা। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ফারঞ্জক (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধিতে ভূষিত হন। বাল্যকালে তিনি উচ্চ

চৰাতেন, যৌবনেৰ শুৱতে যুদ্ধবিদ্যা, কৃষি, বক্তৃতা ও বৎশ তালিকা সম্পর্কে পাইদৰ্শী ছিলেন। হয়ৱত মুহাম্মদ (স.)-এৰ নবুয়তথাপিৰ সময় কুৱাইশ বৎশে ১৭ জন ব্যক্তি লেখাপড়া জানতেন, তিনি তাঁদেৱ মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

ইসলাম গ্ৰহণ

হয়ৱত উমৰ ফাৰুক (ৱা.) ইসলাম গ্ৰহণেৰ আগে আৰু জাহালেৰ নেতৃত্বে ইসলামেৰ বিৱৰণে অবস্থান নেন। তিনি মুসলমানদেৱ উপৰ অত্যাচাৰ ও নিপীড়ন চালাতেন। এমনকি তাৰ চাকৱানীও ইসলাম গ্ৰহণ কৱলে তিনি তাৰ উপৰ নিৰ্যাতন কৱা থেকে বিৱৰণ থাকেননি। তিনি একবাৰ উন্মুক্ত তলোয়াৰ হাতে মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যাৰ উদ্দেশ্যে বেৱ হন। পথে নষ্টম ইবনু আবুল্লাহৰ সাথে তাৰ সাক্ষাৎ ঘটে। নষ্টম বলল, ‘কোথায় যাচ্ছ উমৰ?’ উভৰে রাগতথৰে বললেন, ‘মুহাম্মদকে হত্যা কৱতে যাচ্ছি।’ এ কথা শুনে নষ্টম বলল, ‘আগে তোমাৰ ঘৰ সামলাও। তোমাৰ বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্ৰহণ কৱেছে।’ তিনি অগ্নিশৰ্মা হয়ে বোনেৰ বাড়ি গেলেন। তাৰ বোন ও ভগ্নিপতি তখন পৰিত্ব কুৱানেৰ সূৰা তা-হা পাঠ কৱছিলেন। এমতাবস্থায় হয়ৱত উমৰ (ৱা.)-এৰ উপস্থিতি তাঁদেৱ মধ্যে ভীতিৰ সঞ্চার কৱলেও তাৰা ইমানি চেতনা থেকে সৱে যাননি। হয়ৱত উমৰ (ৱা.)-এৰ জিজ্ঞাসাবাদে তাৱা কুৱান পাঠেৰ কথা জানান। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদেৱ উপৰ আঘাত কৱতে থাকেন। তখন তাৰ বোনেৰ শৰীৰ থেকে রক্ত ঝৰা দেখে তাৰ মনে দয়াৰ উদ্বেক হয়। হয়ৱত উমৰ (ৱা.) তাঁদেৱ বললেন, ‘তোমৰা কী পাঠ কৱছিলে তা আমাকে দেখাও।’ উভৰে তাৰ বোন বলল, ‘কুৱান পাঠ কৱছিলাম। এটা পৰিত্ব গ্ৰহণ, অপৰিত্ব অবস্থায় স্পৰ্শ কৱা যায় না।’ পৱে তিনি পৰিত্ব হয়ে এলে তাঁকে কুৱান মজিদ পড়তে দেওয়া হয়। তখন তাৰ মনে চিন্তাৰ পৱিবৰ্তন হয়। তিনি তখন ইসলাম গ্ৰহণেৰ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স.)-এৰ নিকট যাওয়াৰ আগহ প্ৰকাশ কৱেন। সে সময় রাসূল (স.) সাকা পাহাড়েৰ পাদদেশে হয়ৱত আৱকাম (ৱা.)-এৰ বাড়িতে অবস্থান কৱছিলেন। কোষমুক্ত তৱৰারিসহ হয়ৱত উমৰ (ৱা.)-এৰ উপস্থিতি সাহাবিদেৱ মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি কৱে। হয়ৱত উমৰ (ৱা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-এৰ কাছে কম্পিত কষ্টে বললেন, ‘হে আল্লাহৰ নবি! আমাকে ইসলামে দীক্ষিত কৱলুন। যে তৱৰারি নিয়ে আপনাৰ শিৱিষ্টদেৱ উদ্দেশ্যে বেৱ হয়েছিলাম, আজ হতে সে তৱৰারি উমৰেৰ হাতে ইসলামেৰ শক্তি নিখনে ব্যৱহৃত হবে।’ হয়ৱত উমৰ (ৱা.) হয়ৱত মুহাম্মদ (স.)-এৰ হাতে তখন ইসলাম গ্ৰহণ কৱেন। মূলত তাৰ ইসলাম গ্ৰহণ ছিল হয়ৱত মুহাম্মদ (স.)-এৰ দোয়াৱই ফল। রাসূলুল্লাহ (স.) তাৰ জন্য এভাৱে দোয়া কৱেন, ‘হে আল্লাহ! উমৰ ইবনু হিশাম (আৰু জাহাল) অথবা উমৰ ইবনুল খাতাব এ দুইজনেৰ একজনকে ইসলামে প্ৰবেশ কৱাৰ তাৰফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী কৱলুন।’

খলিফা নিৰ্বাচন

ইসলামেৰ প্ৰথম খলিফা আৰু বকৱ সিদ্ধিক (ৱা.)-এৰ ইন্তিকালেৰ পৱে তাৰ অস্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ৱত উমৰ (ৱা.) ৬৩৪ খ্ৰিষ্টাব্দে ইসলামেৰ দ্বিতীয় খলিফা নিৰ্বাচিত হন। তা অধিকাংশ সাহাবি সমৰ্থন কৱেন।

শাসনব্যবস্থা

হয়ৱত উমৰ (ৱা.) খলিফা নিৰ্বাচিত হওয়াৰ পৱ মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তাৱেৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এ সময় রোম, পারস্য, সিৱিয়া, মিসৰ ও ফিলিস্তিন মুসলিম সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। রাজ্য শাসনে তিনি

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন। আইনের চোখে সকলকে সমানভাবে দেখতেন। এমনকি মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শামাকে শাস্তিদানে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন যেমন কঠোর তেমনি মানুষের দুঃখকষ্টে তিনি ছিলেন অতি কোমল। তিনি সাধারণ প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য রাতের আধারে একাকী বের হয়ে পড়তেন। প্রয়োজনে তিনি নিজের কাঁধে খাদ্যসামগ্রী বহন করে গরিব-দুঃখী মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন। তাঁর শাসনামলে রাজ্যে কোনো অভাব-অন্টন ছিল না। সে সময় কৃষিকাজে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। তিনি ডাক বিভাগ প্রবর্তন, সাম্য ও ন্যায়ের বাস্তব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিজরি সন প্রবর্তন করেন। জনকল্যাণে তিনি অসংখ্য মসজিদ, বিদ্যালয়, সেতু, সড়ক, হাসপাতাল নির্মাণ করেন। পানির জন্য তিনি অনেক খালও খনন করেন। তাঁর সময়েই আরবে সর্বপ্রথম আদমশুমারি চালু হয়। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তিনি বাহিতুলমাল থেকে প্রাণ কাপড় সেই পরিমাণ গ্রহণ করতেন যে পরিমাণ সকলের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাহাড়া জেরজালেমে যাওয়ার পথে ভূত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরার দ্রষ্টান্ত একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরল ঘটনা। ঐতিহাসিক হিতি বলেন, ‘অল্ল কথায় বলা যায়, হযরত উমর (রা.)-এর সরলতা ও কর্তব্যজ্ঞান ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। ন্যায়পরায়ণতা ও একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর শাসনামলের মূলনীতি।’

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত উমর (রা.) খুব সহজসরল ও অনাভ্যুত জীবনযাপন করতেন। অর্ধপৃথিবীর শাসক হয়েও তাঁর কোনো দেহরঞ্জনী ছিল না, খেজুরপাতার আসন ছিল তাঁর সিংহাসন। জনসেবাই ছিল তাঁর ব্রত। ইবাদত বন্দেগিতে অতিবাহিত হতো তাঁর অধিকাংশ সময়। জাগতিক লোভ-লালসা ও জাঁকজমক তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার ব্যাপক সমন্বয় ঘটেছিল।

শাহাদতবরণ

হযরত উমর (রা.) তাঁর গৌরবময় শাসনামলের দশম বছরে মসজিদে নববিতে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় কুফার শাসনকর্তা হযরত মুগীরা (রা.) এর ভূত্য অগ্নিপূজক আবু লুলুর বিষাঙ্গ ছুরিকাঘাতে আহত হন। তিনি আহত হওয়ার তৃতীয় দিন হিজরি ২৩ সনের ২৭শে জিলহজ বুধবার (৩৩ নভেম্বর) ৬৩ বছর বয়সে শাহাদতবরণ করেন। হযরত ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, ‘আমার ধারণা হযরত উমর (রা.) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তখন দশভাগ ইলমের নয়ভাগ তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।’ (তাবারানি) আমরা হযরত উমর (রা.)-এর মহান আদর্শ মেনে চলব এবং সে অনুসারে জীবন গড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচার ও সুশাসন সম্পর্কে বাড়ির কাজ হিসেবে একটি টীকা লিখে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৪

হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

মহানবি (স.)-এর প্রথম স্ত্রী হ্যরত খাদিজা (রা.)। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আব্দুল উয্য্যা নামক পরিবারে ৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খোয়াইলিদ ইবনে আসাদ আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে যায়েদ। বিশ্বের ইতিহাসে যে কয়জন নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ও রাসুলুল্লাহ (স.) একই বংশের ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'তাহিরা' (পুণ্যবতী)। পরিবারিক সূত্রে সম্পদশালিনী বলে তাঁর সুনাম ছিল সমগ্র আরবজুড়ে।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সঙ্গে পরিচয় ও বিবাহ

হ্যরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় লোক নিয়োগ করতেন। তিনি মহানবি (স.)-এর সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে তাঁকে তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করেন। মহানবি (স.) তাঁর ব্যবসার দায়িত্বার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়িক কাজে মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেন। এ ব্যবসায় হ্যরত খাদিজা (রা.) ব্যাপক লাভবান হন।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) সিরিয়া থেকে ফেরার পর হ্যরত খাদিজা (রা.) তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে অবগত হন। তিনি যুবক মুহাম্মদ (স.)-এর অসাধারণ চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাৱ করেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিল তখন ২৫ বছর। আর হ্যরত খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে বিশটি উট মোহরের বিনিময়ে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হ্যরত খাদিজা (রা.) তাঁর সকল সম্পদের দায়দায়িত্ব রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপর ছেড়ে দেন এবং নবি করিম (স.)-কে তাঁর ইচ্ছামতো সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেন। রাসুলুল্লাহ (স.) অকাতরে সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে দান করেন।

সন্তান-সন্ততি

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখের। হ্যরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে মহানবি (স.)-এর তিনি পুত্রসন্তান-কাহিম, আব্দুল্লাহ ও তাহির এবং চার কন্যা-হ্যরত জয়নাব, রুক্কাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পুত্রগণ শৈশবেই দুনিয়া হতে বিদায় নেন। তাতে নবি করিম (স.) অত্যন্ত মর্মাহত হন।

ইসলাম গ্রহণ

হ্যরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হেরো গুহায় নবৃত্যপ্রাপ্ত হয়ে মহানবি (স.) যখন ভীত-সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে ছিলেন তখন হ্যরত খাদিজা (রা.) স্বীয় স্বামীর অবস্থা বুঝতে পেরে বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, 'ভীত হওয়ার কিছু নেই, আল্লাহ আপনাকে অপদষ্ট করবেন না, কেননা আপনি আত্মায়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন, দুষ্ট অভিবীদের সাহায্য করেন, মেহমানদের

আপ্যায়ন করেন এবং ক্ষতিহস্তদের সাহায্য করেন।' এরপর হযরত খাদিজা (রা.) আসমানি কিতাবে অভিজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে তাঁকে নিয়ে ঘান। ওয়ারাকা হেরা গুহায় সংঘটিত ঘটনা শুনে বললেন, 'ভীত হওয়ার কিছু নেই, তিনি সে 'নামুস' (জিবরাইল) যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন।' পরবর্তীকালে মহানবি (স.) আল্লাহর নির্দেশে ইসলাম প্রচার শুরু করলে হযরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবুয়তের দশম বছরে রমায়ান মাসে ইস্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে নবি করিম (স.) গভীরভাবে শোকাহত হন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত খাদিজা (রা.) জাহিলি যুগে জন্মগ্রহণ করেও সৎ চারিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। কখনো কোনো অন্যায় ও অশ্রুল কাজে যোগ দেননি। মহানবি (স.)-এর প্রতি ছিল তাঁর প্রিয় ভালোবাসা। তিনি ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করতেন। ইসলামের খাতিরে তাঁর সকল সম্পদ দান করার কারণে আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর স্বামীভুক্তি ছিল অতুলনীয়। যখন রাসূল (স.) বাইরে যেতেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতেন। আবার তিনি (স.) কখনো বিমর্শ অবস্থায় বাড়ি ফিরলে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সহানুভূতির সাথে সান্ত্বনা দিতেন ও সাহস যোগাতেন।

শ্রেষ্ঠত্ব

মহানবি (স.) বলেছেন, 'হযরত খাদিজা (রা.) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারী' (বুখারি)। একদা হযরত জিবরাইল (আ.) হযরত খাদিজা (রা.) সম্পর্কে রাসূল (স.)-কে বললেন, 'তাঁর প্রভু (আল্লাহ) এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন' (বুখারি ও মুসলিম)। আরও বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক অভিমানের জবাবে রাসূল (স.) বলেন, 'না, আল্লাহ খাদিজার চেয়ে কোনো মহৎ নারী আমাকে দেননি। তিনি এমন সময় আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমার বিপদের দিনে সবাই যখন আমাকে নিরাশ করেছে তখন তিনি আমাকে অর্থ সাহায্য করেছেন' (মুসনাদে আহমাদ)। অন্য এক হাদিসে নবি করিম (স.) বলেছেন, 'বিশ্বের সকল নারীর উপর চারজনের সম্মান রয়েছে— হযরত মারিয়াম (আ.), হযরত খাদিজা (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত আসিয়া (আ.)।' বর্তমান বিশ্বের নারীগণ যদি হযরত খাদিজা (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে, তাহলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অনেক সুন্দর হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত খাদিজা (রা.)-এর উন্নম গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

হ্যরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর জীবনাদর্শ

জন্ম ও পরিচয়

হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরি ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম নোমান, পিতার নাম সাবিত। কিন্তু তিনি আবু হানিফা নামে খ্যাত।

শৈশবকাল

জন্মগতভাবেই ইমাম আবু হানিফা (র.) অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই পৰিত্র কুরআনের হাফিয় হন। তিনি কুরআন, হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তৎকালীন মুহাদিস ও ফকির হাম্মাদ (র.)-এর কাছে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করতেন।

অবদান

ইমাম আবু হানিফা ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহশাস্ত্রবিদ। মানুষ যাতে সহজ ও সঠিকভাবে শরিয়তের বিষয়গুলো পালন করতে পারে সেজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদদের সমষ্টিয়ে একটি ‘ফিকাহ সম্পাদনা পরিষদ’ গঠন করেন। তাঁর সম্পাদিত প্রায় তিরাশি হাজার মাসআলা সংবলিত ‘কুতুবে হানাফিয়া’ রচিত হয়। ইমাম আবু হানিফা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের সমষ্টিয়ে যুক্তিভিত্তিক ও সহজসরল ফিকাহ প্রণয়ন করেন। এ কারণে তাঁর ফিকাহ মুসলমানদের নিকট অতিপ্রিয়। বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মাযহাবের অনুসারী বেশি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.) ও প্রখ্যাত মুহাদিস ইমাম ইবনু মুবারক (র.) প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন।

ইমাম শাফিয়া (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, ‘মানুষ ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মুখ্যপেক্ষী।’ ব্যক্তি হিসেবে ইমাম আবু হানিফা ছিলেন উচ্চমানের ইবাদতকারী ও মুস্তাকি। কথায় ও কাজে তাঁর অপূর্ব মিল ছিল। তাঁর জীবনে কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তিনি অত্যন্ত সহজসরল ও অনাড়িভর জীবনযাপন করতেন।

আববাসি খলিফা আল মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুতার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন ও কারাবরণ করতে হয়। তিনি ১৫০ হিজরি ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল মানসুর কর্তৃক প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার ফলে কারাগারেই শাহাদতবরণ করেন।

আমরা ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে আরও বেশি জানব এবং তাঁর ফিকাহশাস্ত্রের উপর জ্ঞানলাভ করে সুন্দর জীবন গড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ফিকাহশাস্ত্রে জ্ঞানের জনপ্রিয়তা লাভের কারণগুলো চিহ্নিত করবে।

পাঠ ৬

হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর জীবনাদর্শ

হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) ৪৭০ হিজরি মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁকে জিলানি বলা হয়। তাঁর উপনাম আবু সালেহ, উপাধি মুহিউদ্দীন, কৃতুবে রাববানি ইত্যাদি। তাঁর পিতার নাম আবু সালেহ মুসা। তিনি হ্যরত ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা। তিনি ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। এজন্য হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-কে আওলাদে রাসুল বলে গণ্য করা হয়।

এ মহান ওলি বাল্যকাল হতেই শাস্ত, ন্য, ভদ্র, চিন্তাশীল ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। শৈশবে তিনি কুরআন মুখস্থ করেন। জিলানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৮ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ গমন করেন। নিজামিয়া মাদ্রাসায় তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, উসূল, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রমী একজন মহান সাধক ও তাপস হবেন তা তাঁর শৈশবকালের একটি কাহিনি থেকে বোঝা যায়। বর্ণিত রয়েছে যে, দুঃখপৌষ্য অবস্থায় তিনি রম্যান মাসে দিনের বেলায় মাত্তুলুক পান থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর মা তাকে দুধ পান করাতে গেলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) শরিয়তের জ্ঞানার্জনের পর মা'রেফাতের (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান-লাভের জন্য বাগদাদের সুফি-দরবেশদের দরবারে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁর সাথে সাধক হ্যরত হাম্যাদান (রা.)-এর পরিচয় ঘটে। তিনি তাঁর সাহচর্যেই সুফিতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করেন।

হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ২৫ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। ৫২১ হিজরির শেষ তাগে পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসেন এবং দীন প্রচার শুরু করেন।

হ্যরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য অসংখ্য আলেম সমবেত হতেন। তিনি বুধবার স্থানীয় ঈদগাহে সকালবেলায় বক্তৃতা করতেন। কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঈদগাহটির আয়তন বৃদ্ধি করা হয় এবং সেখানে একটি মুসাফিরখানাও স্থাপন করা হয়।

জীবনের শেষ দিকে তিনি দিনের বেলায় খুতবা ও ফতোয়া প্রদানে ব্যস্ত থাকতেন। নিষিদ্ধ পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বছর রোয়া রাখতেন।

তিনি ছিলেন অভাবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর ছাত্রজীবনে বাগদাদে অন্টন দেখা দেয়। তিনি তাঁর নিকট থাকা স্বর্গমুদ্রা থেকে অভাবীদেরকে দান করতেন এবং নিজে খেয়ে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। অসহায়দের প্রতি তাঁর দরদ কেমন ছিল, তা তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, ‘আফসোস তোমার

নিকট পুরোদিনের খাবার মওজুদ আছে। অথচ তোমার নিকটতম প্রতিবেশী উপবাস থাকছে। তোমার ইমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তুমি নিজের জন্য যা চাও অন্যের জন্য তা না চাও।'

এ মহান ওলি বড়পীর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৯০ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরি সনের ১১ রবিউস সানি তারিখে ইস্তিকাল করেন। তাঁর মাজার বাগদাদে অবস্থিত। আমরা বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ব, সদা সর্বদা সত্য কথা বলব, অভাবী ও দুষ্টদের সাহায্য ও সেবা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর চরিত্রের মহৎ গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জেরুয়ালেম যাওয়ার পথে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন
কোন খলিফা?

- ক) হযরত উমর ফারুক (রা.)
- খ) হযরত আবু বকর (রা.)
- গ) হযরত উসমান (রা.)
- ঘ) হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)

২. ইমাম আবু হানিফা (র.)-

- i) যুক্তিভিত্তিক শরিয়তের বিধান প্রবর্তন করেছিলেন
- ii) শাসক দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন
- iii) সুফিবাদের জনক ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রূপনগর গ্রামে জনাব ‘ক’ ও জনাব ‘খ’ বসবাস করেন। এ গ্রামে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ‘গ’ ও ‘ঘ’ গুপ্ত সংঘাতে লিপ্ত হয়। একদিন সংঘাতে এক তরুণ মারাঞ্চকভাবে আহত হয়। এ দৃশ্য দেখে শান্তিপ্রিয় জনাব ‘ক’ মাঝে চিন্তার উদ্বেক হয়। তিনি এলাকার সংঘাতময় অবস্থা দূর করার জন্য কিছু তরুণকে সঙ্গে নিয়ে ‘প’ নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে গ্রামের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি জনাব ‘খ’ তার আয়ের সমস্ত টাকা দরিদ্র গ্রামবাসীদের মাঝে বিতরণ করেন। তিনি ছাপড়া ঘরে বাস করে দিনের অধিকাংশ সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকেন।

৩। জনাব ‘খ’ -এর কর্মকাণ্ডের সাথে কোন মহামানবের কাজের মিল রয়েছে ?

- ক) হযরত উমর ফারুক (রা.)
- খ) হযরত আবু বকর (রা.)
- গ) হযরত উসমান (রা.)
- ঘ) হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)

৪। জনাব ‘ক’-এর সংগঠনটির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে ঐতিহাসিক ঘটনার মিল রয়েছে, তার ফলাফল ছিল—

- i) মহানবি (স.)-এর সকলের নিকট বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ
- ii) সকল গোত্রের মধ্যে পারম্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি
- iii) সুফিবাদের ব্যাপক প্রসার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

স্জনশীল প্রশ্ন

১)

দৃশ্যকল্প-১:

জনাব ‘ক’ একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এলাকার মন্দির, মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তিনি অকাতরে দান করেন। গ্রামের সকল মানুষ তাদের গচ্ছিত সম্পদ তাঁর নিকট নিশ্চিন্তে জমা রাখেন। গ্রামের খণ্ডগ্রাম গরীব মানুষদের খণ্ড মুক্ত করেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষ অসুস্থ হলে তিনি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান।

দৃশ্যকল্প - ২ :

জনাব ‘খ’ ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে। তিনি সবসময় পর্দা করে চলেন। বিয়ের পর ব্যবসায়ের সকল দায়িত্ব স্বামীকে দিয়ে দেন। ‘খ’ দরিদ্র ও অসহায়দেরকেও অকাতরে সাহায্য করেন। স্বামীর বিপদে সহানুভূতির সাথে সান্ত্বনা এবং সাহস দেন।

ক. হিলফুল ফুয়ুল কী ?

খ. আবু বকর (রা.)-কে সিদ্ধিক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. জনাব ‘ক’-এর কর্মকাণ্ডে কোন মহামানবের কাজের মিল রয়েছে? তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জনাব ‘খ’-এর কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্য বইয়ের যে মুসলিম মনীষীর কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে তা চিহ্নিত করে মুসলিম নারীর জীবনে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবি (স.)-কে আল-আমিন বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখো।

২. খাদিজা (রা)-কে শ্রেষ্ঠ নারী বলা হয় কেন?

৩. হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে ফিকহ শাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন?

৪. হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণীয় কেন?

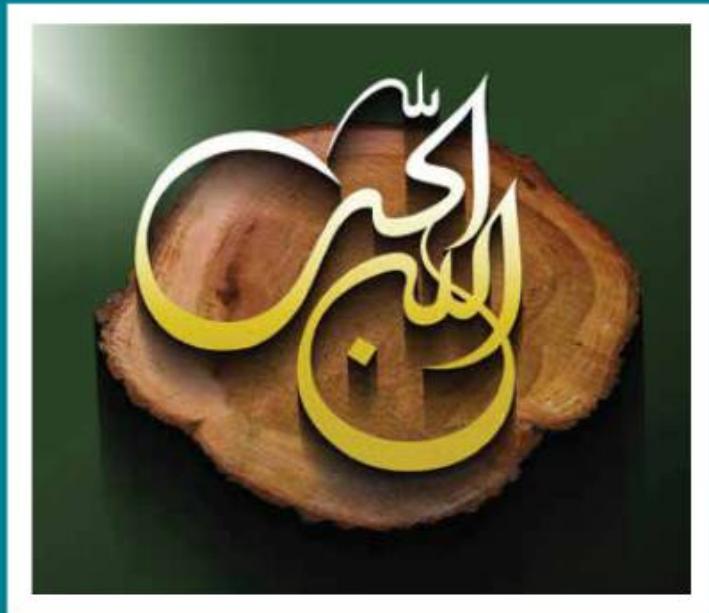
সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ শ্রেণি : ইসলাম শিক্ষা

অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর ।

– আল কুরআন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।